

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - কওমে লুতের আধুনিক সংস্করণ ও

ইসলামি জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা মুনমুন

রোলঃ 23090120175

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - কওমে লুতের আধুনিক সংস্করণ ও

ইসলামি জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক  
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা মুনমুন

রোলঃ 23090120175

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - কওমে লূতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হুমায়রা মুনমুন, আইডিঃ 23090120175 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

এক্সটারনালঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

## ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - কওমে লূতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

হুমায়রা মুন্মুন

(স্বাক্ষর)

হুমায়রা মুন্মুন

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120175

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।  
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| ভূমিকা - .....                                          | 6  |
| কুরআনুল কারীম থেকে বর্ণনা -.....                        | 8  |
| পম্পেই, কওমে লুতের পুনরাবির্ভাব - .....                 | 12 |
| বার্লিন -.....                                          | 14 |
| সমকামীতার উত্থানের নেপথ্যে যারা - .....                 | 15 |
| কার্ল হাইনরিখ উলরিখস - .....                            | 15 |
| ম্যাগনাস হার্শফেল্ড - .....                             | 17 |
| আলফ্রেড কিনসি -.....                                    | 20 |
| জার্মানি থেকে আমেরিকা, বিকৃতির ভ্রমণ -.....             | 22 |
| আমেরিকার রক্ষণশীল সমাজ বনাম বিকৃতি -.....               | 23 |
| সমকামী অধিকার আন্দোলন -.....                            | 24 |
| নারীবাদ ও সমকামীতার যৌথ আন্দোলন -.....                  | 26 |
| লিঙ্গ বাটপারি-.....                                     | 31 |
| সমকামী এন্টিভিজমে ডাক্তারদের অবদান -.....               | 32 |
| হরমোনাল বা শারীরিক ত্রুটি নয় বরং মানসিক বিকৃতি - ..... | 36 |
| অপারেশনের সূচনা - .....                                 | 39 |
| বিকৃতির প্রচারে মিডিয়া -.....                          | 40 |
| বাংলাদেশে বিকৃতির প্রবেশ- .....                         | 42 |
| বিকৃতি যখন উগ্রবাদ -.....                               | 44 |
| ইসলামই সমাধান - .....                                   | 48 |
| সচেতনতাই শক্তি - .....                                  | 50 |
| রেফারেন্স - .....                                       | 51 |

## ভূমিকা -

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন কেবল দুই লিঙ্গে - নর এবং নারী। এর বাহিরে আর কোনো লিঙ্গের অস্তিত্বই তিনি রাখেন নি সৃষ্টির সূচনা থেকেই। শুধু মানুষ না, বরং প্রতিটি মাখলুক বা সৃষ্টিই এই দুই লিঙ্গের একটি। এর বাহিরে কোনো জীবেরই তৃতীয় কোনো পরিচয় নেই। কোনো সৃষ্টিই তার ইচ্ছে মতো কখনোই এই পরিচয়কে বদলে ফেলতে পারেনি।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। আর তাই প্রথম মানব আদম আলাইহিসসালামকে সৃষ্টির পর হাওয়া আলাইহাসসালামকে তার সঙ্গিনীরূপে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে পুরো মানবজাতিকে। কখনোই এর মাঝে পুরুষ ও নারী ব্যতিত অন্য কোনো পরিচয় প্রাকৃতিকভাবে আসেনি, আসা সম্ভবও ছিলো না বা সম্ভব নয় কখনোই। কারন এটাই মানুষের মূল সৃষ্টি কাঠামো, যার কোনো বিকৃতি নেই। মানুষ পৃথিবীতে সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হতে থাকে। তাদের মাঝে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ফিতনাও বাড়তে থাকে। যেসব মানুষ যুগে যুগে তাদের কাছে পাঠানো নবী রসুলগণের আনা ওহী অনুযায়ী আল্লাহর হুকুমগুলো মেনে চলেনি, সোজা পথে না চলে নিজ নাফসের বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বক্রপথ অবলম্বন করেছে তারা পদে পদে পথভ্রষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন পঙ্কিলতা ও বিকৃত কামনা ঘিরে ধরেছে সময়ে সময়ে মানব অন্তরকে। এমনই এক বিকৃতি মানুষের যৌন কামনাতেও ঘটেছে বিতাড়িত শয়তানের ওয়াসওয়াসায় - সমকামিতা বা সম লিঙ্গের প্রতি যৌন কামনা। যা কেবলই সেসব বিকৃত রুচির মানুষের মন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো, আছে।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমনই বিকৃত রুচির লালনকারী এক জঘন্য কওম বা জাতির গল্প বর্ণনা করে জানিয়েছেন - লুত আলাইহিসসালামের কওম। তাদের জঘন্য কাজকর্মের নির্মম পরিণামও রবের কারীম আমাদের জানিয়েছেন। কী ছিলো তাদের সে নিকৃষ্ট কাজকর্ম আর কীসের কর্মফলে তারা এমন অকল্পনীয় ভয়ানক আযাবের মুখোমুখি হলো? এর উত্তরও আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমেই সবিস্তারে জানিয়েছেন। তারা ছিলো সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট, সহজ কথায় সমকামী। তারা পুরুষ হয়েও যৌন আকাজক্ষা পোষন করতো পুরুষেরই প্রতি। তাদের এই বিকৃত রুচি তারা শুধু ঘর বা ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখে নি, বরং একে প্রকাশ্যে প্রচার ও উদযাপন করতো। আল্লাহর নবী লুত আলাইহিসসালাম তাদের বরাবরই বুঝিয়ে এসেছেন নববী দাওয়াতের মাধ্যমে ধৈর্যের সাথে যে এ এক অতিবিকৃত রুচি, তারা পুরুষ হয়ে নিজ নারীদের রেখে স্বজাতি পুরুষের দিকেই

ধাবিত হতে পারে না। কিন্তু বরাবরই হতভাগা কওমে লুত তাদের প্রতি প্রেরিত নবীর আহ্বানকে উপেক্ষা করেছে আর নিজেদের ধ্যানে উন্মাদনায় মত্ত থেকেছে।

আধুনিক বিশ্বেও কওমে লুতের পাপাচার আধুনিক খোলসে কিন্তু একই পঙ্কিলতা নিয়ে পৃথিবীতে আরও ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পরেছে, যা এলজিবিটিকিউ নামে পরিচিত। এলজিবিটিকিউ বা LGBTQ হলো ইংরেজি কিছু শব্দের আদি অক্ষরের সমষ্টি তথা - Lesbian (L), Gay (G), Bisexual (B), Transgender (T) এবং Queer (Q)। এই সব শব্দের মূল বা শেকড়গত অর্থ একটিই, আর তা হলো যৌনবিকৃতি। সমলিঙ্গের প্রতি কওমে লুতের আকর্ষণ ছিলো তাদের যৌন বিকৃতি, তা কিনা আধুনিক সময়ে এসে আরও জঘন্য ও বৈচিত্রময় রূপ নিয়েছে।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক বিষয় যেটা হয়ে দাড়িয়েছে বর্তমান সময়ে তা হলো, এই বিকৃতকামী গোষ্ঠী কেবল নিজেদের বিকৃত চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং বিশ্বব্যাপি সাধারণ মানুষও যেনো একে সাপোর্ট করে সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কওমে লুতের ব্যাপারে জানি যে তারাও বিকৃতিকে উদযাপন করতো প্রকাশ্যে, কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অবস্থা এমন হচ্ছে দিন দিন যে সচেতনতার অভাবে বিকৃতিকে ঘৃণা করা মানুষও বিকৃতিকে শব্দের মারপ্যাঁচে মেনে নিচ্ছে আর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিচ্ছে নিজের অজান্তেই।

সমাজ, দেশ ও জাতিকে বিকৃতির কবল থেকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই মানুষকে সচেতন হতে হবে। মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বিকৃতিকে দমন করতে হবে। ইসলাম যতোদিন মানুষের মাঝে জীবন্ত থাকবে ততোদিন সেসব সমাজে বিকৃতি বাসা বাঁধতে পারবে না। আর সবচেয়ে জরুরী যা, বিকৃতিকে প্রতিহত করতে এর ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্রগুলোর ব্যাপারে জানতে হবে বিস্তারিতভাবে।

## কুরআনুল কারীম থেকে বর্ণনা -

কওমে লুতের ঘটনা কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সুরায় আলোচিত হয়েছে। তবে এর মূল ঘটনাটি সূরা হুদ আয়াত ৭৭-৮৩, সূরা ইব্রাহিম আয়াত ৯, সূরা হিজর আয়াত ৫৮-৭৭, সূরা আনকাবুত আয়াত ২৮-৩৫, সূরা সাফফাত আয়াত ১৩৩-১৩৮, সূরা কাসাস আয়াত ৩১-৩২, সূরা ফুরকান আয়াত ৪০, সূরা 'আরাফ আয়াত ৮০-৮৪, এবং সূরা শু'আরা আয়াত ১৬০-১৬৬ সহ আরও অনেক সুরায় উল্লেখ আছে, যা কওমে লুতের ওপর আল্লাহর আযাব এবং তাদের বিকৃত আচারের বিস্তারিত বিবরণ দেয়।

কওমে লুতের ঘটনা কুরআনুল কারীমে:

সূরা হুদ (১১:৭৭-৮৩):

"এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ লুতের নিকট আসিল তখন তাহাদের আগমনে সে বিষণ্ণ হইল এবং নিজেকে তাহাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল, 'ইহা নিদারুণ দিন!' তাহার সম্প্রদায় তাহার নিকট উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায় ! ইহারা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য ইহারা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই?' তাহারা বলিল, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কি চাই তাহা তো তুমি জানই।' সে বলিল, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি আশ্রয় লইতে পারিতাম কোন সূদৃষ্ট স্তম্ভের!' তাহারা বলিল, 'হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালক - প্রেরিত ফিরিশতা। উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ পিছন দিকে তাকাইবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। উহাদের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। নিশ্চয়ই প্রভাত উহাদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর - কঙ্কর, যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। ইহা জালিমদের হইতে দূরে নয়।"

এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের ওপর আযাব পাঠিয়েছেন। তাদের পক্ষিল কর্মকাণ্ড ছিল স্পষ্ট এবং তারা আল্লাহর রাসুল লুত (আঃ)-কে অস্বীকার করেছিল।

সূরা হিজর (১৫:৫৮-৭৭):

"উহারা বলিল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে - 'তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই ইহাদের সকলকে রক্ষা করিব, 'কিন্তু তাহার স্ত্রীকে নহে; আমরা স্থির করিয়াছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' ফিরিশ্তাগণ যখন লূত - পরিবারের নিকট আসিল, তখন লূত বলিল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।' তাহারা বলিল, 'না, উহারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি; 'আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী; 'সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না তাকায়; তোমাদেরকে যেখানে যাইতে বলা হইতেছে তোমরা সেখানে চলিয়া যাও।' আমি তাহাকে এই বিষয়ে ফায়সালা জানাইয়া দিলাম যে, প্রতুষে উহাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হইবে। নগরবাসিগণ উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'উহারা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইয্যত করিও না। 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।' উহারা বলিল, 'আমরা কি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই?' লূত বলিল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে।' তোমার জীবনের শপথ, উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হইয়াছে। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদেরকে আঘাত করিল; আর আমি জনপদকে উল্টাইয়া উপর নীচ করিয়া দিলাম এবং উহাদের উপর প্রস্তর - কংকর বর্ষণ করিলাম। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ - শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। উহা তো লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই ইহাতে মু'মিনদের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।"

এখানেও কওমে লূতের আজাবের কথা বলা হয়েছে, যেখানে তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল এবং তাদের শহরকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল।

সূরা আনকাবুত (২৯:২৮-৩৫):

স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হইতেছ, তোমরাই তো রাহাজানি করিয়া থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক।' উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, 'আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর - যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।' যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা এই জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করিব, ইহা অধিবাসীরা তো জালিম।' ইব্রাহীম বলিল, 'এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে।' উহারা বলিল, 'সেখানে কাহারা আছে, তাহা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূতকে ও তাহার

পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত ; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।’ এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের জন্য সে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল এবং নিজেকে তাহাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। উহারা বলিল, ‘ভয় করিও না, দুঃখ করিও না ; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ; ‘আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে শাস্তি নাযিল করিব, কারণ উহারা পাপাচার করিতেছিল।’ আমি তো বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছি।”

এই সুরায় লুত (আঃ) ও তার সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে তাদের পাপাচার, লুত (আঃ)-এর দাওয়াত এবং তাদের ওপর আল্লাহর আজাব আসার কথা বলা হয়েছে।

সূরা 'আরাফ (৭:৮০-৮৪):

"আর আমি লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। ‘তোমরা তো কাম - তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর; তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।’ উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ‘ইহাদেরকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিস্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চায়।’ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাহাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।”

এই সুরায় লুত (আঃ) তার সম্প্রদায়ের পাপের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কিভাবে তাদের সতর্ক করেছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা শু'আরা (২৬:১৬০-১৭৫):

"লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল, যখন উহাদের ভ্রাতা লূত উহাদেরকে বলিল, তোমারা কি সাবধান হইবে না? ‘আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমারা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ‘আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে। ‘বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সঙ্গে উপগত হও, ‘এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদেরকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।’ উহারা বলিল, ‘হে লূত ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে।’ লূত বলিল, ‘আমি তো তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি। ‘হে

আমার প্রতিপালক ! আমাকে এবং আমার পরিবার - পরিজনকে, উহারা যাহা করে, তাহা হইতে রক্ষা কর। অতঃপর আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবার - পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম। তাহাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" এখানেও লুত (আঃ) এর দাওয়াত এবং সম্প্রদায়ের পাপাচারের কথা বলা হয়েছে, যার ফলস্বরূপ তাদের ওপর আজাব নেমে এসেছিল।

## পম্পেই, কওমে লুতের পুনরাবির্ভাব -

পম্পেই ও হেরকুলেনিয়াম ছিল ইতালির দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, আধুনিক নেপলস (নাপোলি) শহরের কাছাকাছি অবস্থিত দুইটি প্রাচীন রোমান নগরী। খ্রিস্টাব্দ ৭৯ সালে নিকটবর্তী ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাতের ফলে শহরগুলো মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং ৪ থেকে ৬ মিটার পুরু আগ্নেয় ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে যায়।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে খাল খননের সময় আর্কিটেক্ট দোমেনিকো ফনতানা এখানে কিছু প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সে সময় বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে পুনরায় খনন শুরু হলে ১৭৩৮ সালে হেরকুলেনিয়ামের ধ্বংসাবশেষ এবং ১৭৪৮ সালে পম্পেই নগরী পুনরায় আবিষ্কৃত হয়।

তবে অগ্ন্যুৎপাতের আগেও এই অঞ্চল প্রকৃতির ভয়াবহ আঘাতের শিকার হয়েছিল। খ্রিস্টাব্দ ৬২ সালে এক প্রবল ভূমিকম্প কাম্পানিয়া অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। পম্পেই, হেরকুলেনিয়াম এবং আশেপাশের অনেক শহরই এতে আক্রান্ত হয়েছিল। পম্পেই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও তখনই পুনর্নিমাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু ১৭ বছর পরে, যখন পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান ছিল এবং বহু ঘরবাড়ি এখনো সম্পূর্ণ পুনর্নির্মিত হয়নি, ঠিক তখনই অগ্ন্যুৎপাত এসে সবকিছু চিরতরে বদলে দেয়। চোখের পলকেই যেনো এক প্রানবন্ত নগরী রূপ নেয় ধ্বংসস্তূপে। ১৫ লক্ষ টন গলিত পাথর, গুড়ো হয়ে যাওয়া আকরিক আর উত্তপ্ত তরল বিষ্ফিণ্ড হয়ে প্রায় ২১ মাইল উপরে উঠে আসে যার তাপমাত্রা হিরোশিমায় ফেলা নিউক্লিয়ার বোমের চাইতেও এক লক্ষ গুন বেশি ছিলো! অতিরিক্ত তাপ, ম্যাগমা ইত্যাদি জ্বালিয়ে দেয় আশেপাশের সব, আর মানুষগুলোকে বানিয়ে দেয় প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত মমি, যার দরুন প্রায় হাজার বছর পরও আজও মানুষ তাদের পরিণতি পরিলক্ষিত করতে পারছে পম্পেই নগরে ঘুরতে গেলে। বর্তমানে পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ সাধারণ মানুষের জন্য দর্শনীয় স্থান হিসেবে উন্মুক্ত রয়েছে।

ইতালির এক জাকজমক নগরী ছিলো পম্পেই। বিনোদন, আমোদ-প্রমোদই যেনো সে নগরীর নিত্যদিনের চিত্র ছিলো। আধুনিকতার লেসে যাকে বলা যায় অতি সভ্য, প্রগতিশীল আর মুক্তমনাদের মিলনমেলা।

এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া এককালের তথাকথিত প্রগতিশীল জাতির আরও একটি পরিচয় ছিলো। এরা ছিলো বিকৃতরুচির এক জাতি। ঠিক যেনো কওমে লুতের হাজার হাজার বছর পরের প্রত্যাভর্তন ঘটে পম্পেই নগরীতে! বিকৃতির সাক্ষ্য দিয়েছে শহরটির দেয়ালগুলো পর্যন্ত! এরা এমন কোনো বিকৃতকামই যেনো বাকি রাখে নি করতে। শিশুকাম, পশুকাম তো ছিলো জনসম্মুখে উদযাপন করে খেলা দেখার মতো আয়োজন। বিনোদনের নেশায় তারা এতোটাই

বিভোর ছিলো যে আল্লাহ বড় আযাবের পূর্বে ছোটো আযাব হিসেবে একবার আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ দেখানোর পরেও তাদের মাঝে এই অপকর্মগুলো ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার কোনো প্রবনতাই আসে নি।

পম্পেইয়ের এই ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সেকুলার ও অবিশ্বাসী দুনিয়া সভ্যতার সাধারণ কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবেই নেবে, নিয়েছেও ইতোমধ্যে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী তথা মুসলিম মাত্রই পম্পেইয়ের এই দুর্যোগের সাথে এক ভয়ানক আযাবের যোগসূত্র করতে পারবে। যে আযাব এসেছিলো এই বিপর্যয়ের হাজার হাজার বছর পূর্বেও। খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের বিশ্বাস মতে সডোম ও গমোডা জাতির ওপর, আর মুসলিমদের বিশ্বাসমতে লুত আলাইহিসসালামের জাতির ওপর, যেমনটা কুরআনে উল্লেখ আছে। সডোম জাতির নাম অনুসারেই সমকামিতা বা কওমে লুতের বিকৃতাচার "সডোমি" নামে পরিচিত ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলোতে।

লুত আলাইহিসসালামের জাতির ওপরও এমনই এক ভয়াবহ আযাব এসেছিলো, আবার সে আযাব আসার পূর্বে তাদের জন্য যথেষ্ট সতর্কবানীও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বিকৃতিতে মত্ত থাকা সে জাতি শুনেনি তাদের নিজেদেরই সৎ ব্যক্তি ও নবী লুত আলাইহিসসালামের বারংবার করা নিষেধগুলো ও সতর্কবানীগুলোকে। মূলত তারা শুনতে চায়নি, নাফসের অন্ধ অনুসরণই ছিলো তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। যার দরুন তাদের মুখোমুখি হতে হয় এমন এক মুহুর্তের, যখন সবার আগে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হয় আসমানি আদেশে। অতঃপর পুরো জমিনকে শূন্যে তুলে ১৮০ ডিগ্রির মতো উল্টো করে সজোরে আছাড় মারা হয় মাটিতে। এর পরেই ক্রমাগত প্রস্তরবর্ষন শুরু হয় আকাশ হতে। একেরপর এক আযাব সেদিন চলছিলোই, যেনো পুরো প্রকৃতি সেই বিকৃতিকে সহিতে না পেরে মালিকের হুকুমে তছনছ করছিলো চারিদিক।

আল্লাহ বিকৃতিকে এতোটাই ঘৃণা করেছেন। তিনি বলেছেন কেউ যেনো তাঁর সৃষ্টিতে বিকৃতি না ঘটায়। আর বিকৃতকামী এসব জাতি যৌনতার রুচির ব্যাপারে এমন জঘন্য বিকৃতির অনুসরণ করেছে যে তাদের পরিনতি সেসব সভ্যতা ধ্বংসের পরেও পরবর্তী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের অবলোকনের জন্য প্রকৃতিতে সংরক্ষিত করে রেখে দেয়া হয়েছে। যেমনটা আমরা দেখি কওমে লুতের আযাবের স্থানে অস্বাভাবিক লবনাক্ততায় ভরপুর থাকা জর্ডান নদী বা ডেড সাই আর ইতালির পম্পেইয়ের ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা আর ছাইয়ের নিচে বিশেষভাবে হাজার বছর প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত মানবদেহগুলো আর তাদের স্থাপনা ও তাতে করা বিকৃতির চিহ্নগুলোতেও।

## বার্লিন -

বার্লিন জার্মানির একটি নগরী। কেবল নগরী বললে কম হয়ে যাবে এর পরিচয়ের জন্য। বার্লিন ছিলো এক সময়কার জীবন্ত নগরী, যেমনটা এখন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বা নিউইয়র্কের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

আধুনিকতার প্রায় সব উপকরণ নিয়ে সজ্জিত ছিলো এই নগরী। অশ্লীলতা বেলেল্লাপনায় যেনো পুরো পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যেতো সে। পতিতাপল্লি, মদ এগুলো বার্লিনের সাধারণ স্বাভাবিক চিত্র ছিলো।

বিকৃত যৌনাচারীদেরও স্বর্গভূমি ছিলো এই নগরী। পতিতালয়গুলোতে শুধুই নারী পতিতা নয় বরং বালক ও পুরুষ পতিতাও পাওয়া যেতো। এদের খদ্দেরও ছিলো সেখানে। তবে পুরুষ পতিতারার কেবল অর্থের আশায় নিজেদের দেহ বিকাতো, তারা সবাই যে সমকামী ছিলো তা নয়। কিন্তু যারা খদ্দের ছিলো তারা মোটেও স্বাভাবিক যৌনাচারের কেউ ছিলো না, বরং বিকৃতিতে মত্ত ছিলো উন্মাদের মতো।

জার্মানির আইন অনুসারে বিকৃত যৌনাচার প্রকাশ্যে চর্চা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ ছিলো প্যারাগ্রাফ ১৭৫ অনুযায়ী। তাই এসব বিকৃত পতিতালয়ে গমনও কেউ প্রকাশ্যে করতে পারতো না। কেউ ধরা পরলে সাজা হতো। এমন অনেক পতিতালয় পুলিশি অভিযানের পর বন্ধও করা হয়েছে। কিন্তু তবু বিকৃতকামীরা থামে নি। আইনের অগোচরে হলেও এই পাপ তারা চালিয়ে যেতো, বলি হতে হতো অসংখ্য হতোভাগা বালককে যারা দারিদ্রের টানে এমন অপকর্মে জড়াতো।

এই সেই বার্লিন যেখান থেকে আধুনিক সমকামীতার আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। কালের পরিক্রমায় এমন অনেকেই এই বার্লিন থেকেই উঠে আসে যারা আধুনিক সমকামী আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়ে আছে। বিকৃতির এক জীবন্ত উদাহরন হিসেবে বার্লিন যেনো আতর্জিৎকার করে গেছে প্রতিবারই।

## সমকামীতার উত্থানের নেপথ্যে যারা –

বিকৃতিকে স্বাভাবিকীকরণে অনেকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এন্টিভিজম করেছে। তবে আধুনিক সমকামিতা আন্দোলনের আজকের অবস্থানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত কিছু নাম একেবারেই উল্লেখ না করলেই না। তার মাঝে কিছু ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আলোচনা করা হলো।

## কার্ল হাইনরিখ উলরিখস –

কার্ল হাইনরিখ উলরিখস, যার হাত ধরে আধুনিক কওমে লুতের উত্থান ঘটে। যার তত্ত্বগুলো আজও বিশ্বব্যাপি সমকামী অধিকার আন্দোলনে ব্যবহার হয়ে আসছে। ১৮২৫ সালে জার্মানির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ওয়েস্টারফেল্ড গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। যথেষ্ট পড়াশোনার পর একজন সফল ব্যারিস্টার হয়েছিলেন তিনি। তার ক্যারিয়ার জীবনে তিনি ছিলেন সফল, অন্যকোনো দিকে তার ভাবার প্রয়োজনই ছিলো না। কিন্তু তার মনে বাসা বেধেছিলো বিকৃত যৌনতার কামনাবাসনা। ছোটবেলায় স্কুলে থাকতে ১৪ বছর বয়সে তার স্কুলের এক পুরুষ প্রশিক্ষকের দ্বারা ধর্ষনের শিকার হয়েছিলেন, যা তার মনের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলো। নিজেও একসময় বিকৃত রুচির চর্চা শুরু করে। এরই রেশ ধরে তার উজ্জ্বল ক্যারিয়ার চলাকালে জার্মানির বার্লিনে থাকা পতিতালয়ে তার গমন শুরু হয়, তবে মেয়ে নয়, অল্পবয়সী ছেলে পতিতা! প্রথমে গোপনে যাওয়া-আসা করতে করতে একসময় কোনো রাখঢাক ছাড়াই প্রকাশ্যে সেসব এলাকায় যাওয়া শুরু করে সে। এতে করে তার ক্যারিয়ারে প্রভাব পরে, চাকুরীচ্যুত করা হয় তাকে।

কিন্তু এতেও সে থামেনি। বিকৃতির নেশা তাকে পেয়ে বসেছিলো। সমাজে সে সম্মানও হারাতে চায় নি আবার এই বিকৃত কুৎসিত চিন্তাও বদলাতে চায় নি। বিকৃতি তার দুর্বলতা না বরং চয়েস ছিলো। সব সমকামীদের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এমনই, এটা তাদের মাদকসেবনের মতো দুর্বলতা নয় বরং নিজেদেরই মনের সিদ্ধান্ত। তাই সমকামীরা এই বিকৃত রুচিকে ছাড়ার কথা না ভেবে বরং একে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া। এই অধিকারের ধারনারই গোড়াপত্তন করে উলরিখস। সে চেয়েছিলো যেহেতু সমাজে সমকামিতা ঘৃণিত কাজ বলে সমকামীদের সম্মান দেয়া হয় না, তাই একে কোনোভাবে সম্মানের আসনে বসাতে পারলে আর অসম্মানের জায়গা থেকে মানুষের চিন্তাকে সরাতে পারলে সে নির্দিধায় তার বিকৃতির চর্চা করতে পারবে, সমাজে নিজ সম্মান না হারিয়েই।

এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই সেই ১৮৬৩ সালে বেনামি লিফলেট ও পুস্তিকার মাধ্যমে সমকামিতাকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে অভিহিত করে এর অধিকারের জন্য প্রচারণা চালাতে থাকে।

জার্মানির তৎকালীন আইনে সডোমি বা পায়ুসঙ্গম নিষিদ্ধ ছিলো যা "প্যারাগ্রাফ ১৭৫" হিসেবে পরিচিত ছিলো। উলরিখস এই আইন বাতিলের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। সে লক্ষ্যে ১৮৬৭ সালে মিউনিখে জার্মান আইনজ্ঞগণের একটি সম্মেলনে অংশ নিয়ে উলরিখস পায়ুসঙ্গম বিরোধী এই আইন তথা প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের দাবি জানায় আর জোর দিয়ে বলে যে, এই আইন (তার দাবী অনুযায়ী) প্রাকৃতিক যৌন তাড়না (তথা সমকামকে) চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর কিছু মানুষকে (তথা সমকামীদের) বৈষম্যের শিকার করছে। তার এই উদ্ভট দাবি সেদিন সে সম্মেলনে গৃহীত হওয়া তো দূর, বরং উপস্থিত ৫০০ আইনজ্ঞ, সরকারি কর্মকর্তা এবং একাডেমিশিয়ানগণ তাকে ভর্ৎসনা করে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। যদিও এই মানহানিকর প্রত্যক্ষানের পরেও উলরিখসের কাছে এই দাবি উত্থাপন ছিলো একটি সফল প্রচেষ্টা!

উলরিখস কিছু ধারণামূলক তত্ত্বের প্রণোয়ন করেন যা পরবর্তী আধুনিক সমকামী অধিকার আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে, আজও সমকামীরা এসব অপ্রমাণিত আর অযৌক্তিক তত্ত্বকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়।

তার তত্ত্বগুলোর মাঝে ছিলো -

*সমকামিতা জন্মগত* - সে দাবি করে গর্ভ থেকেই শিশু সমকামী (তার ভাষায় আর্নিং) হয়ে অস্তিত্বে আসে। অর্থাৎ সমকামের পুরো ব্যাপারটাকে সে এই তত্ত্বের দ্বারা প্রাকৃতিক বলে দাবি করে। কারন কোনো আচরন প্রাকৃতিক হলে তো তার দায়ভার মানুষের ওপর বর্তায় না, তাই সমকাম প্রাকৃতিক হলে কেউ একে আইন প্রয়োগের দ্বারা বাঁধা দিতে পারবে না।

*তৃতীয় লিঙ্গের ধারণা* - মানবসমাজে লিঙ্গ কেবল দুইটিই, নারী ও পুরুষ। কিন্তু উলরিখস দাবি করে সমকামীরা তৃতীয় লিঙ্গের, তথা তারা সাধারণ নারী বা পুরুষের মতো না। তাদের দেহ নারী বা পুরুষের হলেও মনের দিক থেকে তারা ভিন্ন। ঐ সময়ে জার্মানিতে সমকামিতাকে কোনো ভালো নামে উল্লেখ করা হতো না, সডোমাইট (সডোমী তথা সমকামীতা চর্চাকারী) বলে ডাকা হতো। উলরিখস এদের নামকরণ করে 'আর্নিং' শব্দের দ্বারা, যাকে পরবর্তীতে হাঙ্গেরিয়ান কার্ল মারিয়া কেটবেনি 'সমকামী' নামে পরিবর্তন করে।

*সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন (যৌন অভিমুখিতা)* - উলরিখস মানুষের যৌন অভিমুখিতা বা রুচির ধারণা প্রণয়ন করেন। আগে যেখানে সমকামী ও অসমকামী হিসেবে শ্রেণিবিভ্যাস করা হতো সেখানে পরে বাইসেক্সুয়াল বা উভকামীও যোগ হয়। দাবি করা হয় কিছু মানুষের নারী পুরুষ উভয়ের প্রতিই যৌন আকর্ষণ থাকার ব্যাপারে।

উলরিখস মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পুস্তিকা ও লিফলেটের মাধ্যমে সডোমী তথা সমকামীতার স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা তার জীবদ্দশায় সফল না হলেও সফল হয় তার মৃত্যুর বেশ পরে, তারই বুনে যাওয়া বিকৃতির তত্ত্বের বীজের মাধ্যমে।

### ম্যাগনাস হার্শফেল্ড –

উলরিখসের জীবদ্দশায় সমকামীতার আন্দোলনের তেমন কোনো অগ্রগতি করতে না পারলেও তা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে তার পরবর্তী প্রজন্মে, ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের হাত ধরে। উলরিখসের জীবদ্দশাতেই তার জন্ম হয় পোল্যান্ডের এক ইহুদি পরিবারে। মেডিসিনে পড়াশোনা করা হার্শফেল্ড উলরিখসের দেখানো পথ অনুসরণ করে সমকামী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়ে ওঠে। সমকামীদের মাঝে সে 'আন্টি ম্যাগনেসিয়া' (Aunt Magnesia) নামে জনপ্রিয় ছিলো। ক্রসড্রেসার হিসেবে নিয়মিতই সে ড্র্যাগ পারফরম্যান্সে অংশ নিতো। ড্র্যাগ শো মানে পুরুষ হলেও নারীর পোশাক পড়ে প্রদর্শনীর জন্য স্টেজ পারফর্ম করা। আজও এই ড্র্যাগ শো পশ্চিমা দেশগুলোতে এলজিবিটি আন্দোলনে গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়।

ম্যাগনাস হার্শফেল্ড নিজেও একজন বিকৃত যৌনকামী ছিলেন। উলরিখসের লেখনী ছাত্রজীবনে তাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। এই গভীর প্রভাবই তাকে সমকামী অধিকার আন্দোলন নিয়ে কাজ করতে ভীষনভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

হার্শফেল্ড পেশায় ছিলেন একজন সম্মানিত ডাক্তার ও গবেষক। সমাজে তার বেশ সুনাম সুখ্যাতি ছিলো। মেডিকেল পড়াশোনা শেষ করেই ১৮৯৬ সালে বার্লিনে ডাক্তার ও 'যৌন গবেষক' হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করে সে। এখানেই ঠিক তার পরের বছরই সে তৈরি করে পৃথিবীর প্রথম সমকামী অধিকার সংস্থা Scientific Humanitarian Committee (SHC) যার উদ্দেশ্য ছিলো মূলত সমকামীতার প্রচার তবে শব্দের মারপ্যাচ দিয়ে লোকচক্ষু আর মনোযোগের আড়ালে।

এসএইচসি নামক এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিলো চারটি - কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের দর্শন ও কাজকে আগানো, জার্মান সমকামবিরোধী আইন প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিল করা, এ আইনের কারণে গ্রেফতার হওয়া সমকামীদের আইনি সাহায্য দেয়া আর সমকামিতাকে মেডিক্যাল সমস্যা বলে চালিয়ে দেয়া তথা জনসাধারণকে এমন বুঝ দেয়া। শেষের উদ্দেশ্যটা হার্শফেল্ডের নিজ চিন্তালব্ধ একটা ছিল ছিলো। সে সমকামিতার ধারণাকেই এমনভাবে বদলে মানুষের

সামনে উপস্থিত করার চিন্তা করে যেন মানুষ একে আর অস্বীকার করার শক্তি খুঁজে না পায় বা কারন দর্শাতে না পারে।

হার্শফেল্ড তার বানানো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'বিজ্ঞানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার' শ্লোগানে পুরোদমে সমকামিতার বৈধতা আদায়ের লক্ষ্যে মাঠে নামে। ১৮৯৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ বছর ধরে জার্মান সংসদে প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের জন্য তার টীম আবেদন জানাতে থাকে, যদিও প্রতিবারই সেসব আবেদন নাকচ করা হয়েছে। সাথে তারা রাজনৈতিক নেতাদের পেছনেও ঘুরতে থাকে তাদের সমর্থন লাভের জন্য যাতে এই আন্দোলন শক্তিশালি গতি পায়, কিছু দলের সাপোর্ট পেয়েও যায়! জার্মান স্যোশাল ডেমোক্র্যাট পার্টি এমনই এক দল ছিলো যারা প্যারাগ্রাফ ১৭৫ আইন বাতিলের দাবিকে সমর্থন করে। হার্শফেল্ড বুঝতেন যে, 'বিজ্ঞান আসলে রাজনৈতিক', তাই কেবল তত্ত্ব আর যুক্তির পেছনে না দৌড়ে বিকৃতির অধিকার আদায়ের এই যাত্রাকে রাজনীতির সাথে জুড়ে দেন ম্যাগনাস হার্শফেল্ড।

১৯০৩ সালে হার্শফেল্ডের উদ্যোগে 'প্রোপাগান্ডা কমিশন' গঠন করে এইচএসসি, যার উদ্দেশ্য ছিলো বিপুল পরিমাণে প্রচারণার মাধ্যমে সমকামিতার বৈধতা অর্জন। এই লক্ষ্যে জার্মানি জুড়ে লক্ষ লক্ষ লিফলেট, পুস্তিকা বিতরণ, সেমিনার ও বক্তৃতার আয়োজন করে সাধারণ জনগণ ছাড়াও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব সরকারি কর্মকর্তা, ডাক্তার, আইনজীবী, একাডেমিশিয়ান-গবেষক আর স্কুল শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয় বিকৃতির বার্তা।

প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের লক্ষ্যে সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকদের থেকে এর সমর্থনে প্রায় ৬০০০ স্বাক্ষর জোগাড় করে এসএইচসি যাদের মাঝে ইহুদি বিজ্ঞানী আইন্সটাইনসহ বিভিন্ন দার্শনিক, একাডেমিক, শিল্পী এবং রাজনীতিবিদরাও ছিলেন! এর প্রতিক্রিয়ায় পরের বছর জার্মান সংসদে বিতর্ক হয় এবং সমকামবিরোধী আইন বাতিলের প্রচেষ্টা আবারও ব্যর্থ হয়। সমকামীতাকে 'জন্মগত' ও 'প্রাকৃতিক' হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে হার্শফেল্ড বারবারই ব্যর্থ হয়। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বানানো তত্ত্ব প্রচার করেছে যার সবগুলোই পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মূলত তার উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ছিলো না, বরং যেকোনো উপায়ে আন্দোলনের সফলতা অর্জনই ছিলো তার মূল লক্ষ্য। তাই সত্যমিথ্যা বা যুক্তিপ্রমাণাদির ধার না ধেরেই নিজের পক্ষে যে তত্ত্বকেই কাজে লাগানো যায় মনে হতো তা ই লুফে নিতো। আজও আধুনিক সমকামী একটিভিস্টরা যুক্তির ধার না ধেরে নিজেদের পক্ষে কোনো তত্ত্বকে সামনে পেলেই তা তুলে ধরে আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে।

হার্শফেল্ড নিজেকে সমাজের সামনে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করতো, একজন সফল ডাক্তার হিসেবে সমাজে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিলো সে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন ছিলো খুবই কদর্যময়। সে তার ইনস্টিটিউটে গবেষণা শিখতে আসা ছাত্রদের সাথেই প্রায়ই যৌন সম্পর্কে জড়াতো। বার্লিনের সেই ইনস্টিটিউটে তার একজন 'প্রেমিক'ও ছিলো কার্ল

গীষ নামের। তার ইনস্টিটিউটে অতিথি হিসেবে যাওয়া ব্যক্তিদের সামনেও তার এমন বিকৃত রূপ সামনে আসতো, তাহলে লোকচক্ষুর আড়ালে আরও কতো জঘন্য হতো সে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ম্যাগনাস হার্শফেল্ড ১৯১৯ সালে আরেক যুগান্তকারী কাজ করে বসে। যৌন বিকৃতিকে সমাজে স্বাভাবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গবেষনার নামে 'ইনস্টিটিউট ফর সেক্সুয়াল সায়েন্স' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। এখানেই ১৯২০ সালে পৃথিবীর প্রথম তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি' করা হয়। ১৯৩০ সালে ডেনমার্কের আইনার ওয়েগনার নামের এক পুরুষ হার্শফেল্ডের কাছে আসেন লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য। যার অনুপ্রেরণা সে পেয়েছিলো এক অস্ট্রিয়ান এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ইউজেন স্টেইনাচের থেকে যে কিনা পুরুষ গিনিপিগ আর নারী গিনিপিগের যৌনাঙ্গ প্রতিস্থাপন করেছিলেন। এই অনুপ্রেরণা নিয়ে হার্শফেল্ডের কাছে আসলে হার্শফেল্ড তাকে খোজাকরন করে কৃত্রিম যৌনী প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। এই অপারেশনের দেড় বছর পর লিলি তথা আইনার ওয়াগনার মারা যান।

১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউট বহাল তবীয়তেই কাজ চালাতে পারছিলো। তবে হিটলার আসার পর হার্শফেল্ডের লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সে সময় হার্শফেল্ড জার্মানিতে উপস্থিত না থাকায় প্রানে বেঁচে যায়, তবে তার লিঙ্গ পরিবর্তনের সার্জারীর সেই ঘটনাটি এরই সাথে প্রায় ২০ বছরের জন্য চাপা পড়ে।

## আলফ্রেড কিনসি -

ড. আলফ্রেড কিনসি, যুলজি বা প্রাণিবিদ্যায় ডক্টরেট করা একজন গবেষক কিন্তু সমকামিতা আন্দোলনের ইতিহাসে বলা যায় সবচেয়ে কালিমাযুক্ত একজন ব্যক্তিত্ব।

কিনসি যৌনতাকে রংধনুর মতো বৈচিত্র্যময় বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে যৌনতার কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। যৌনতার ক্ষেত্রে কোনো ন্যায় অন্যায় নেই। একেকজনের যৌন অভিরুচি একেকরকম হতে পারে, তাই মানুষ কেবল বিপরীত লিঙ্গ বাদে যে সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হবে তা নয়, বরং এই চিন্তারও সীমা ছাড়িয়ে যৌনতা নাকি আরও বৈচিত্র্যময়। মানুষ কেবল মানুষের সাথেই না, পশুর সাথেও যৌন সম্পর্কে যেতে পারে। শিশুকাম, পশুকাম এগুলো সবই কিনসির 'রংধনু' যৌন বৈচিত্র্যের অংশ। রংধনুর দুই পাশের একপাশে স্বাভাবিক যৌনতা আর অন্যপাশে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা, এই দুইয়ের মাঝে সাত রঙের মতো ছড়িয়ে আছে শিশুকাম, পশুকাম, উভকাম সহ আরও শত বিকৃত যৌনরুচি! যৌনতা তার কাছে বর্ণালির মতো।

আলফ্রেড কিনসি সাধারণ যুলজিস্ট একাডেমিশিয়ান থেকে যৌন বিশেষজ্ঞ কীভাবে হয়ে ওঠেন তার পেছনের গল্পটা মোটেও স্বাভাবিক কোনো চিত্র ছিলো না। প্রভাবশালী রকাফেলার ফাউন্ডেশন, মিডিয়া আর তার কর্মস্থান ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় তাকে এই ব্যাপারে এতোটা সমর্থন আর সাহায্য জুগিয়েছে যে অল্প সময়ের ব্যবধানেই কিনসি আমেরিকার এক সুপরিচিত মুখ হয়ে যান। রকাফেলার ফাউন্ডেশন অনেক মোটা অংকের অর্থ খরচ করে তার জন্য বিভিন্ন সেমিনার বক্তৃতার আয়োজন করে আর তার পাবলিসিটি করতে থাকে। নিউজপেপারগুলো লিঙ্গ নিয়ে লেখা তার প্রথম বই প্রকাশের আগেই অনেক জল্পনাকল্পনা আর রঙচঙ মাখিয়ে জনসম্মুখে উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে থাকে, এতে করে তার বই প্রকাশ হতেই বেস্টসেলার বইয়ের তালিকায় চলে যায়।

কিনসি প্রায় পনেরো বছর ধরে মানুষের সামনে যৌন গবেষক হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি ধরে রেখে মানুষের সামনে নিজের তৈরি করা পরিসংখ্যান উপস্থিত করে। এর জন্য সাক্ষাৎকার নেয় কয়েক হাজার মানুষের আর তার ওপর দুই পর্বের বই প্রকাশ করে পুরুষ ও নারী যৌন আচরণ নিয়ে আলাদা করে। সে তার পরিসংখ্যানে দেখিয়েছে - "আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষেরই নৈতিক অবক্ষয় আছে। বেশিরভাগ পুরুষই বিয়ের আগেই যৌন অভিজ্ঞতা নেয়, ৬৯% পতিতাদের কাছে যায়, ৪৫% পরকীয়া করে। তাদের মাঝে ১০% সমলিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্কে যায়, জীবনে একবার হলেও। ৮% পুরুষ পশুকামী হয়।"

তার এই পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে সে মানুষের মাঝে প্রচার করেছে যে, যৌনতার কোনো নৈতিকতা নেই। মানুষ এমনিতেই বিকৃত যৌনাচার করে কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তা

গোপন রাখে। তার দাবী সমাজের বহু লোক সমকামীতা, উভকামীতা, বহুগামীতায় লিপ্ত। এই দাবীর ভিত্তিতেই সে রঙধনুর কনসেপ্ট আনতে পেরেছে।

কিনসি যে পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে সাধারণ মানুষের মাঝে বিকৃতির একটা 'একাডেমিক' প্রচার করছিলো, সে পরিসংখ্যানই ছিলো আপাদমস্তক একটা ছলনা! এতে ছিলো প্রচুর কারচুপি আর মিথ্যার ছড়াছড়ি। যাদের ওপর পরিসংখ্যানটি চালানো হয়েছে সেই ৪৫০০ পুরুষের ১২০০ থেকে ১৪০০ জনই ছিলো যৌন অপরাধে অভিযুক্ত। বিশাল সংখ্যক সাক্ষীরাই ছিলো ধর্ষক, শিশু ধর্ষক, পতিতা, সমকামী, সমকামী পুরুষ পতিতা, যৌন অপরাধে জেল খাটা মানুষজন।

একটা পরিসংখ্যানের ১০০ জনের ৬০-৭০ জনকেই যদি ইচ্ছে করে খারাপ লোক হিসেবে বাছাই করে নিয়ে দেখানো হয় যে বেশিরভাগ মানুষই খারাপ, তাহলে তা পরিসংখ্যানের নামে কেবল জালিয়াতি ছাড়া আর কি! কিনসির কাজগুলোও এমন-ই ছিলো। এমন না যে তার পরিসংখ্যানে ভুল করে এমন ফাঁকফোকর এসেছে, এগুলো ছিলো তার ইচ্ছাকৃত। উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের মাঝে একটা ভুয়া প্রমাণ উপস্থাপন যাতে করে সাধারণ জনতা তাৎক্ষণিক কোনো পাল্টা যুক্তি দিতে না পারে বিকৃতির প্রচারের বিরুদ্ধে।

কিনসির ষড়যন্ত্র সফল হয়েছিলো। ফলস্বরূপ আমেরিকার তৎকালীন রক্ষনশীল খ্রীস্টধর্মের অনুসারী সভ্য শালীন সমাজে এমন এক নৈতিক অবক্ষয়ের বিস্তারণ ঘটে যা থেকে আমেরিকা নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। যে রক্ষনশীল সমাজে প্রকাশ্যে নারীপুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ঘৃণিত ও নিন্দিত কাজ ছিলো, তার বাধ ভেঙে দেয় কিনসির পরিসংখ্যান ও তত্ত্ব। ১৯৬০ এর দশক থেকেই তাই আমেরিকার নৈতিক পতন হতে শুরু করে। মুক্তচিন্তার নামে ঠাই নেয় অশ্লীলতা আর বিকৃতির অবাধ সামাজিক প্রচার।

ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের মতো কিনসিও ছিলো সমাজে সম্মানিত এক ব্যক্তিত্ব। মানুষের সামনে সে ছিলো এক সম্মানিত গবেষক যে কিনা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে। কিন্তু তার আসল ভাবমূর্তি ছিলো লুকায়িত, যা ছিলো খুবই কদর্যময় আর বিদঘুটে। তার গবেষণার নামে কাজকর্ম ছিলো আরও জঘন্য, বিদঘুটে আর অমানবিক!

কিনসি কেবল শিশুদেরই ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তা বর্ণনা করলেই যে কারো কেঁপে ওঠার কথা। শুধুমাত্র এই প্রমাণ করার জন্য যে শিশুরাও যৌনতার স্বাদ নিতে পারে। এটা প্রমাণ করতে নিতান্ত দুধের বাচ্চা থেকে শুরু করে কিশোর বয়সী শিশু পর্যন্ত সে তার অভিনব কৌশল প্রয়োগ করে আর সেগুলোর রেকর্ড রাখে।

## জার্মানি থেকে আমেরিকা, বিকৃতির ভ্রমণ –

কওমে লুতের আধুনিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিলো জার্মানির বার্লিনে। কিন্তু তার বিস্তার বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পরে জার্মানির সীমা ছাড়িয়ে আমেরিকা থেকে। জার্মানি থেকে আমেরিকায় বিকৃতি প্রচারের এই ভ্রমণ ঘটে হিটলারের নাৎসি বাহিনী কর্তৃক জার্মান শাসনকাল শুরু হবার পর। হিটলারের বাহিনী জার্মানি থেকে সমকামী আন্দোলন ও এই সম্পর্কিত ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের গবেষণাগারের সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। জার্মানিতে তাই বিকৃতির আন্দোলন আর সুবিধা করে উঠতে পারছিলো না। কিন্তু বিকৃতির শিখা নিভেও গেলো না এতে, নতুন বিষফোড়ার মতো জেগে ওঠে আমেরিকার বুকে জুড়ে। ড. আলফ্রেড কিনসি ছিলো আমেরিকায় বিকৃতির প্রচারের পথিকৃৎ। পারমানবিক বোমা যেমন জাপানের দুই নগরীকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিয়েছিলো, সেভাবেই আলফ্রেড কিনসি আমেরিকার বুকে বিকৃতির বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। তার চতুর পরিকল্পনা আর ছলচাতুরীর ফাঁকে তৎকালীন রক্ষনশীল সমাজেও ছড়িয়ে পরতে থাকে বিকৃতি। যারা একসময় সাধারণ অশ্লীলতাকেও ঘৃণা করতো তারাও দেখা যায় প্রকাশ্যে বিকৃতির বিরোধীতা করতে সংকোচ করতে শুরু করে। মিডিয়া, প্রভাবশালী ক্ষমতাধর বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র সংখ্যক এই বিকৃতকামীদেরকে অসহায় আর সংখ্যালঘু হিসেবে সবার মাঝে প্রচার করতে থাকে। শব্দের মারপ্যাচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিকৃতিকে নরমালাইজ করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়।

## আমেরিকার রক্ষনশীল সমাজ বনাম বিকৃতি -

আমেরিকা, বর্তমানে তথাকথিত আধুনিকতার শীর্ষে যে রাষ্ট্র। মুক্তচিন্তার নামে অশ্লীলতা আর নৈতিক অবক্ষয়পূর্ণ যে সমাজ আজ আমেরিকায় আমরা দেখতে পাই তাও একসময় রক্ষনশীল সমাজ ছিলো। ধর্মীয় মূল্যবোধের ধার না ধারা বর্তমান পশ্চিমা সমাজের এই চিত্র সবসময় এমন ছিলো না। খ্রিষ্টীয় ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে বেষ্টিত আমেরিকার সভ্য রক্ষণশীল সমাজ তার রক্ষনশীলতা হারিয়েছে ধীরে ধীরে ধর্ম ও নৈতিকতাবিমুখ হওয়া থেকে। ১৯৫০ এর দশকেই আমেরিকায় আদর্শিক দ্বন্দ পুরোদমে চলছিলো। একদিকে নারীবাদ, তার সাথে যুক্ত হয় সমকামিতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকা একটা রক্ষনশীল সমাজ গঠনে তৎপর ছিলো। নারী-পুরুষের প্রকাশ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কই সে সমাজে চরম ঘৃণার আর নিগ্রহের বিষয় ছিলো, আর লিভ টুগেদারের মতো প্রকাশ্য বেহায়াপনা ছিলো কল্পনাভীত। এমন না যে মানুষ এসব অপরাধ তখন করতো না, তবে লোকচক্ষুর আড়ালে করতে হতো। এমনকি ১৯৫০ এর আগে পর্যন্ত টেলিভিশনে বা মিডিয়ায় প্রেগন্যান্ট শব্দটা উচ্চারণও গ্রহণযোগ্য ছিলো না। এমন রক্ষনশীল সভ্য সমাজকে ছুট করে বদলে দেয়ার জন্য জরুরী ছিলো চিন্তাভাবনার মাঝে ভাইরাস ঢোকানো, অপসংস্কৃতি আর বিকৃত চিন্তার ভাইরাস।

## সমকামী অধিকার আন্দোলন –

সমকামী অধিকার আন্দোলন শুরু হবার কথা ছিলো জার্মানির ভূমিতে, যেখানে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস আর ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের মতো মানুষেরা নিজ নিজ উপায়ে সমকামীতাকে নরমালাইজ করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু বিকৃতির প্রচারের বীজ জার্মানে রোপিত হলেও এটাকে অধিকার বানানোর আন্দোলনের শুরু হয় জার্মানেরই এক আমেরিকান অভিবাসীর হাত ধরে জার্মান পেরিয়ে বহুদূরে, আমেরিকায়।

হেনরি গারবার জন্মেছিলেন জার্মানির ব্যাভারিয়ায়। তারই উদ্যোগে আমেরিকায় প্রথম বিকৃতিকে অধিকার বানানোর আন্দোলন শুরু হয়। সে ২১ বছর বয়সে আমেরিকায় পরিবারসহ পারি দিয়েছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার চাপে তাকে জন্মভূমির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমেরিকান যোদ্ধা হিসেবে জার্মানিতে ফিরতে হয়। সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগে থেকেই গারবার ছিলেন বিকৃত যৌনাচারী। জার্মানিতে ফেরার পর তার বার্লিনে যাতায়াত শুরু হয়। সেসময় সে বার্লিনের অন্ধকার জগতের সাথে পরিচিত হয়। আমেরিকার রক্ষনশীল খ্রিস্টান সমাজে যেখানে বিকৃত যৌনকামনা চরিতার্থ করতে হতো লুকিয়ে চুরিয়ে, সেটা কিনা বার্লিনে লোকসম্মুখে প্রকাশ্যে করা যায়। এই সুযোগে গারবারের বিকৃতির সাথে আরও বেশি গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়, যা তাকে এর নরমালাইজেশনের জন্য আন্দোলন করার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের সংগঠন এসএইচসি থেকে সেও অনুপ্রেরণা পায় বিকৃতি প্রচারের।

আমেরিকা ফিরে গারবার গঠন করে আমেরিকার প্রথম সমকামী সংগঠন "Society for Human Rights"। আরও প্রকাশ করে প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন "Friendship and Freedom"। যৌনতাকে মানবাধিকার ও স্বাধীনতা হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকে গারবার। কিন্তু গারবারের উদ্যোগ পুরোপুরি সফল হয়নি। এক বছর পরেই বালকদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগে গারবারসহ তার সংগঠনের তিন নেতাকে আটক করে মার্কিন পুলিশ। কোনরকম জামিন নিয়ে বের হতে পারলেও পরবর্তীতে তার আন্দোলন আর সে চালিয়ে যেতে পারে নি। তবে ইতোমধ্যে আমেরিকায় বিকৃতিকে নরমালাইজ করার উদাহরন তার মাধ্যমেই পেশ করা হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালে আলফ্রেড কিনসির বিকৃতির ওপর লেখা প্রথম বই প্রকাশ হলে হ্যারি হেই নামক এক আমেরিকান খুবই প্রভাবিত হন এর দ্বারা। হ্যারি হেই ছিলেন দশ বছরের বিবাহিত পুরুষ। কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের মতো তারও কৈশরে প্রথম এক নাবিকের সাথে যৌন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে তার মাঝেও বিকৃতির দানা বাঁধতে থাকে। যদিও সে চেষ্টা করেছিলো স্বাভাবিক জীবনযাপন করার, তাই বিয়ে সংসারেরও চেষ্টা করেছিলো। তবুও মাঝে

মাঝে স্ত্রীর অজান্তে বিকৃত যৌনাচার চালিয়ে যেতো সে। একদিকে বিকৃতি থেকে বের হতে চাওয়া আরেকদিকে এতে ধরা পরে থাকা, এক অপরাধবোধে ভুগতে হতো হ্যারিকে।

এমন সময় কিনসির বই পড়ে হ্যারি হেই এর চিন্তা প্রচণ্ড আলোড়িত হয়। অপরাধবোধ থেকে বের হয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক ভাবা শুরু করে সে। কারন কিনসি বলেছিলো যৌনতা বর্ণালির মতো, এর কোনো নৈতিক রেখা থাকতে পারে না। নতুন এই উপলব্ধি হ্যারিকে পরিণত করে সমকামী অধিকার আন্দোলনের সৈনিকে।

হ্যারি হেই এর শক্ত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিলো। সে ছিলো একজন কমিউনিস্ট। তাই কীভাবে রাজনৈতিক কলাকৌশলের দ্বারা বিকৃতির আন্দোলনকে সফল করা যায় তা তার জানা ছিলো। এরই উদ্দেশ্যে আমেরিকার সমমনা সমকামীদের নিয়ে হ্যারি গড়ে তোলে গোপন নেটওয়ার্ক। ছোট ছোট সেলের মতো গ্রুপ বানিয়ে ফেলে তিন বা ততোধিক সমকামীদের নিয়ে। দুই বছর গোপনে নিজেদের কার্যকলাপ চালানোর পর ১৯৫০ সালে "The Mattachine Society" নামে প্রকাশ্যে আসে হ্যারির সমকামী দল। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো সমকামীদের একত্রিত করা, সমকামীদের সংখ্যালঘু হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা, সমাজে সমকামীদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা, যেসব সমকামীরা সমকামীতার জন্য নিগ্রহের স্বীকার হয়েছে তাদের সাহায্য করা।

সমকামী অধিকার আন্দোলনের জন্য হ্যারি অনুসরণ করে মার্ক্সবাদকে। সমকামীদের সংখ্যালঘু ও নিপীড়িত গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করে এগিয়ে নিতে থাকে আন্দোলনকে।

## নারীবাদ ও সমকামীতার যৌথ আন্দোলন -

নারীবাদ বা ফেমিনিসম আর সমকামীতার আন্দোলনের একটা গভীর যোগসূত্র আছে। এদের একটি আরেকটি থেকে যেমন সুবিধা নিয়েছে তেমনি একটি আরেকটির জন্য রাস্তাও করে দিয়েছে। বর্তমান আধুনিক সমকামীতার আন্দোলনের সফলতার পেছনের ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের বিরাট অবদান অনস্বীকার্য।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝের সময়টায় ফেমিনিসমের আন্দোলনের শুরু হয়। সে সময় পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম ছিলো বেশ জনপ্রিয় আর বহুল চর্চিত। কমিউনিজমের মূল মন্ত্র ছিলো পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণি আর খেটে-খাওয়া শ্রমিক তথা শোষিত শ্রেণির মধ্যকার শ্রেণিবিভেদ মিটিয়ে দেয়া। মার্ক্স ও বাকুনি ছিলেন কমিউনিজমের নেতাপর্যায়ের সমাজ দার্শনিক যারা সমাজতন্ত্রের জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়ে গেছেন। তাদের মতে পুঁজিবাদী সমাজ শ্রমিক সমাজের শ্রমের মূল্য দেয় না। শ্রমিকশ্রেণিকে শ্রমিক হিসেবে অবমূল্যায়ন করা হয়, হেয় করা হয়। নিপীড়িত এই শ্রমিকসমাজের নিপীড়ন বন্ধ করতে কমিউনিজম মুভমেন্ট চালানো হতো। ফেমিনিস্টরা এই কমিউনিজমের থিওরীকেই তাদের স্বার্থে নিজেদের ওপর প্রয়োগ করে।

কমিউনিজমে সমাজকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত তথা শোষক আর শোষিত শ্রেণি। ফেমিনিস্টরাও নিজেদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে বেছে নেয় কমিউনিজমকে। নারীকে দেখায় শোষিত হিসেবে, পুরুষ দ্বারা শোষিত নিগৃহীত নিপীড়িত শ্রেণি হিসেবে। নারীবাদের ভাষায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ শোষক আর নারী শোষিত। নারীর শ্রম, সময়, ইফোর্ট, সাফল্য সব নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ। পরিবার কাঠামোর কারনে নারী আটকা পরে এই শোষণের শেকলে। পরিবার না থাকলে নারী স্বাধীন হবে।

পরিবার বিমুখ করতে হলে প্রয়োজন হিসেবে আসে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি। নারী নিজে কাজ করে অর্থ উপার্জন করলে সে হবে আত্মনির্ভরশীল, পুরুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী। তাই শুরু হয় পুরুষের তালে নারীরও ঘরের বাহিরে যেয়ে কাজ করার অসুস্থ প্রতিযোগিতা।

নারীকে স্বাধীনতার ছলে কাজের জন্য ঘর থেকে বের করতে পারলেও দেখা দেয় একের পর এক বিপত্তি। প্রকৃতিই যেখানে নারীর বাহিরে যেয়ে ভারী ও লম্বা সময় ধরে কাজ করার বিরুদ্ধে সেখানে আন্দোলন করে আর কী হাসিল করা যায়! বিপত্তি বাধে নারীর মাতৃত্ব। মাতৃত্বকালীন সময়ে বিভিন্ন দুর্বলতা তাকে পুরুষের সমান তালে কাজ করতে বাঁধা দিতে থাকে। তাই এবার নারীবাদীরা পাতে নতুন কুবুদ্ধি - নারীকে মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে।

মার্ক্সবাদী নারীবাদী একটিভিস্ট আলেক্সান্দ্রা কোলোনটাইয়ের মতে মাতৃত্বের শেকল থেকে মুক্তি দিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শিশুর ভরনপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। তাহলেই নারী স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে বাঁচতে পারবে। এতে করে পরিবার বিমুখ হওয়াও নারীর জন্য সহজ হবে। সর্বাবস্থায় নারীকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন আর অমুখাপেক্ষী করাই তখন ফেমিনিজমের উদ্দেশ্য ছিলো।

এভাবেই একদিন শুরু হয় নারীবাদের সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় ঢেউ, নারীবাদী সিমন দ্য বেভোয়ার হাত ধরে। ফ্রেঞ্চ দার্শনিক সিমন ছিলেন এক ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম নেয়া মেয়ে। ছোটবেলায় নান হবার স্বপ্ন থাকলেও বড় হতে হতে মদ আর প্যারিসের অন্ধকার উশৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায় সে। একসময় ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে সিমন নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করে ও আরেক জনপ্রিয় নাস্তিক জ্য পল সার্ত্রের সাথে সম্পর্ক শুরু করে। সার্ত্রের মতে মানবপ্রকৃতি বলে কিছু নেই যেহেতু তা তৈরি করার স্রষ্টাই নেই। তাই মানুষ নিজেকে যা মনে করে সে তা ই হতে পারে। এই থিওরী একই সাথে নারীবাদ ও সমকামিতা উভয় শ্রেণিকেই অযুহাত দেয় যা ইচ্ছা তা করার।

বেভোয়া আর সার্ত্রের সম্পর্ক সাধারণ দাম্পত্যের মতো ছিলো না। তারা উভয়েই ছিলো বহুগামী। বেভোয়া কেবল পুরুষই না বরং নারীদের প্রতিও আসক্ত ছিলো। নিজের কিশোরী ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগও এসেছে তার বিরুদ্ধে। সে তার নিজের যৌনক্ষুধা মেটানোর পর কিশোরী মেয়েদের তুলে দিতো সার্ত্রের হাতে, সেও কিশোরীদের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলো। এই ছিলো তাদের অন্ধকার জীবনের একটা দিক।

নিজেদের জীবনের অন্ধকার তারা বাকিদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে সোচ্চার ছিলো। নারীবাদী আন্দোলন কোনো নিঃস্বার্থ আন্দোলন ছিলো না, ঠিক যেমনটা সমকামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। নারী পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খল থেকে বের না হলে তাদের মতো নরখাদকদের খপ্পরে পরা সহজ নয়।

চালিয়ে যেতে থাকে বেভোয়া তার একটিভিজম। তার মতে যতক্ষণ পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক টিকে থাকবে ততক্ষণ বিপ্লব অক্ষমই থেকে যাবে। বেভোয়ার একটা বিখ্যাত উক্তি আছে - "One is not born, but rather becomes, a woman" অর্থাৎ কেউ নারী হিসেবে জন্মায় না বরং নারীতে পরিণত হয়। তার মতে পরিবার, সমাজ নারীকে নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে তাকে নারী বানায়। এই ছাঁচ থেকে বের হলেই নারীর মুক্তি মিলবে। নারীর শরীর থাকলেই তাকে নারীর ভূমিকা পালন করতে হবে, এটা সমাজ নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এই থিওরী সমকামীরাও পরবর্তীতে ব্যবহার করে কুইয়্যার থিওরীতে। নারীর শরীর মানেই দুর্বল, এই চিন্তা নারীদের বিকৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ফেমিনিজমের এন্টিভিজম না

হলে এই চিন্তার প্রসার ঘটানো এতোটাও সহজ হতে পারতো না। নারী মুক্তির নামে ফেমিনিজম নারীকে ও সমাজকে এগিয়ে নিয়েছে বিকৃতির অমানিশার দিকে।

### আইন পাশের সফলতা -

কোনো দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার বিভিন্ন উপায় থাকে। তার মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো আইনের মাঝে সে দাবীকে ঠাঁই দেয়ানো। একবার কোনো কিছুর ব্যাপারে আইন পাশ হয়ে গেলে পরে সেটা নিয়ে কাজ করা সহজ হয়ে যায়। কেউ সে দাবীর বিরোধিতা করতে গেলেই দেখা যায় আইনের ভয় দেখিয়ে সহজেই চুপ করিয়ে দেয়া যায়। নারীবাদীরা যেমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন পাশ করিয়ে নিজেদের জায়গা বানিয়ে নিয়েছিলো, সমকামীরাও এমনই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন পাশ করিয়ে বর্তমান সময়ের অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে। অনেক চড়াই উৎরাই করে হলেও মানুষের সচেতনতার আড়ালে সমকামিতাকে আইনের আশ্রয় দিতে পেরেছে। এর সূচনা হয়েছিলো আমেরিকাতেই, বিকৃতির অধিকার আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠছিলো তখন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়টাকে বলা যায় আন্দোলনের প্রহর। বিভিন্ন দাবীতে দলবেঁধে আন্দোলনে নামতো মার্কিন জনতা। ব্রিটিশ জনতাও বিভিন্ন আন্দোলন ও দাবী আদায়ে এই সময়কালটাকেই ব্যবহার করেছিলো। সুযোগ বুঝে সমকামী জনতাও তাদের বিকৃতির স্বাভাবিককরনের জন্য দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামে এই সময়েই।

গ্রেটস্ট জেনারেশন তথা ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়া মার্কিনীদের উদ্যোগে যুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকার সমাজ ছিলো সভ্য শান্ত আর সম্ভ্রান্ত। খ্রিস্টীয় নাগরিক ধর্মের প্রতি অনুরাগ রেখে মার্জিত জীবন যাপন করছিলো। এই কনজার্ভেটিভ সমাজে বিকৃতির দাবী তোলা সমকামীদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো। কিন্তু ৫০ এর দশক থেকে বিভিন্ন প্রথা বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে দুর্বল হয়ে পরে রক্ষণশীল সমাজের ভিত। মানুষ ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে দূরে যেতে থাকায় যেসব অপরাধকে প্রকাশ্যে চর্চা করা একসময় লোকলজ্জার ভয়ে কল্পনাতেই ছিলো সেসব অপরাধ প্রকাশ্যে করার প্রবনতা বাড়তে থাকে। এমনই সময় মাঠে নামে বিকৃতকামীরাও। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আর আন্দোলনের ফাঁকে বিকৃতিকেও পরিবর্তন আর সংখ্যালঘু বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাতে থাকে একদল বিকৃতকামী।

হারি হেইয়ের করা সুপরিপক্কিত আন্দোলন রূপ নেয় বড় আকারে। ছোট ছোট গ্রুপ করে বেড়ে উঠে একসময় প্রকাশ্যে ম্যাটাচিন স্যোসাইটি হিসেবে সামনে আসার পর প্রকাশ্যেই আন্দোলন শুরু করে হারির দল। নিজেদের সংখ্যালঘু আর নীরহ দেখানো ছিলো তাদের একটা কৌশল আন্দোলনকে টিকিয়ে রেখে সফল হবার।

সমকামীদের যৌন বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষকে লাগামহীন হবার বার্তা পৌঁছানো হয়েছে। বোঝানো হয়েছে জীবনে যৌনতাই একমাত্র জরুরী কাজ, এ ছাড়া আর কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। তাই সুস্থ বা বিকৃত সর্বাবস্থায় যৌনতৃপ্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য! ইসলামে যেটাকে উল্লেখ করা হয়েছে প্রবৃত্তিপূজা হিসেবে, সেটারই দিকে রীতিমতো দাওয়াত দিয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলো বিকৃতকামীরা।

রক্ষণশীল আমেরিকাতে সমকামীতা গ্রহণযোগ্য ছিলো না। তাই প্রকাশ্যে বিকৃতির চর্চাকারীদের পুলিশি অভিযান করে গ্রেফতার করা হতো। এটাকেই একসময় ইস্যু বানিয়ে ফেলে সমকামীরা। ১৯৬৯ সালে ২৮ জুন নিউইয়র্কের গ্রীনউইচ ভিলেজের স্টোনওয়াল নামক মদের বারে সমকামীদের আড্ডা চলছিলো অন্যান্য দিনের মতোই। প্রায়ই এখানে পুলিশ অভিযান করে কিছু সমকামী গ্রেফতার করে নিয়ে যেতো, এতে কেউ কোনোদিন কোনো ঝামেলা করেনি। কিন্তু ২৮ জুন পুলিশ অভিযানে আসলে সমকামীরা হঠাৎ ত্রুদ্ধ হয়ে ওঠে আর ভাংচুর করা শুরু করে বারের ভেতর। অল্প সময়ের ব্যবধানেই বারের ভেতর তুলকালাম কান্ড ঘটে গেলো যার রেশ প্রায় পাঁচদিন পর্যন্ত ছিলো। এই ঘটনাকে স্টোনওয়াল দাঙ্গা বলে প্রচার করা হয়। মিডিয়া একে এমনভাবে প্রচার করে যে ব্যাপারটা সামান্য থেকে গুরুতর দেখায়। এই উত্তপ্ত সময়কে পুঁজি করে সমকামীরা মাঠে নামে অধিকার আদায়ের দাবীতে। বর্ণবাদ আর নারীবাদের মতো সমকামীদেরও নিগৃহীত হতে হচ্ছে বলে দাবী তুলে। নারী, নিগ্রো বা ইহুদী যেমন আলাদা গোষ্ঠী তেমনই সমকামীরাও আলাদা গোষ্ঠী, এই দাবিতে সমকামীদের সমকাম না ছাড়ানোর দাবী তোলে বিকৃতচারীরা।

স্টোনওয়ালের দাঙ্গা সমকামীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিলো। সে সময়কার আন্দোলনের রেশ ধরে এক বছর পর সমকামীরা নিউইয়র্কে তাদের প্রথম পদযাত্রা কর্মসূচি আয়োজন করে যাকে প্রাইড প্যারেড বলে ঘোষণা করা হয়। এর তিন বছর পর American Psychiatric Association (APA) মানসিক রোগের তালিকা থেকে সমকামীতাকে বাদ দেয়। এই বাদ দেয়ার পেছনে ছিলো সমকামীদের হুমকিধমকি, চাপাচাপি, এসোসিয়েশনের ভেতরে ঢুকে গালাগালি সহ বিভিন্ন হ্যারেজমেন্ট। এতে করে এপিএ বাধ্য হয় সমকামীতাকে লিস্ট থেকে বাদ দিতে।

এপিএ এর এই বাতিলকরন সমকামীদের জন্য আরেক সুযোগ করে দেয়। তারা দাবী তোলে, যেহেতু সমকামীতা মানসিক কোনো সমস্যা নয় তাহলে একে কেনো নিষেধ করা হবে বা অস্বাভাবিক ধরা হবে। ১৯৭৪ সালে সমকামী নারী ক্যাথি কোয়াচেঙ্কো মিশিগানের সিটি কাউন্সিলের মেম্বরশিপ পায়। এটা সমকামীদের রাজনৈতিক দিকে শক্তি দেয়। আরও কয়েক বছর পর ১৯৭৭ সালে কোর্টের রায়ে সমকামীতাকে নৈতিক স্থলন হিসেবে চিহ্নিত করা বাতিল করা হয়। এ বছরই হার্ভে মিল্ক নামের আমেরিকার ডেমোক্রট পার্টির এক

রাজনীতিবিদ প্রথম প্রকাশ্য সমকামী পুরুষ হিসেবে রাজনৈতিক পদ পায়। তার নির্বাচনী প্রচারণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো সমকামীতা। হার্ভে মিল্কের অনুরোধেই সমকামী আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে রংধনু পতাকাকে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৯ সালে বিকৃতির অধিকারের দাবিতে সমকামীদের সাথে মাঠে নামে লক্ষ মানুষ!

এভাবেই আমেরিকায় বিকৃতির স্বাভাবিককরন শুরু হয় আইন পাশের মাধ্যমে।

## লিঙ্গ বাটপারি-

বিকৃতির আন্দোলনে সবাই যে নিজেদের কামনা আদায়ের জন্যই আন্দোলন করেছে তা ই নয়, বরং কেউ কেউ এই আন্দোলনকে পুঁজি করে ক্যারিয়ার উঁচু করারও চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ আর্থিক লোভেও কেউ কেউ সমকামীতাকে নরমালাইজ করার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। এমনই একজন হ্যারি বেঞ্জামিন।

সে নিজে কোনো সমকামী ছিলেন না, বরং স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ছিলো তার। কিন্তু তার ছিলো টাকার নেশা। যেকোনো মূল্যেই অর্থ অর্জন ছিলো তার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে পুরুষের পুরুষত্ব বাড়ানোর টোটকা হিসেবে টেস্টোস্টেরন হরমোন বিক্রি করলেও পরবর্তীতে সমকামীতাকে পুঁজি করার ফন্দি আঁটে বেঞ্জামিন।

হ্যারি বেঞ্জামিন জার্মানের বার্লিনের বংশদ্ভূত। মেডিকেল পিএইচডি শেষে যৌনতা নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটে যোগ দেয় সে। তাই হার্শফেল্ডের গবেষণা আর কাজকর্ম নিয়ে বেশ ভালোই ধারণা ছিলো বেঞ্জামিনের। হার্শফেল্ডের থেকে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের ধারণা নিয়ে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে তার বন্ধু আলফ্রেড কিনসির বুদ্ধিতে সে ট্রান্সসেক্সুয়ালিজম নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করা শুরু করে। ট্রান্সসেক্সুয়াল শব্দটা আগে কেবল ইংরেজি একটা শব্দ হিসেবে থাকলেও একে সমকামের সাথে জুড়ে দিয়ে জোড়ালো ভাবে এর প্রচার করতে থাকে বেঞ্জামিন।

বেঞ্জামিন ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে স্বাভাবিক আর 'ভুল দেহে আটকা পরা'র চিন্তাকে উল্লেখ করে দৈহিক গড়নকে 'প্রকৃতির ভুল' বলে দাবী করে। তার দাবী ছিলো নারীর দেহে আটকা পরা মনে মনে পুরুষ বা পুরুষের দেহে আটকা পরা মনে মনে নারী এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির উপায় লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারী।

এটাই ছিলো বেঞ্জামিনের বিজনেস ক্রাইটেরিয়া। লিঙ্গ নিয়ে দ্বিধায় থাকা মানসিক রোগীদের সে মিথ্যে আশ্বাস দিতে থাকে যে লিঙ্গ পরিবর্তন অসম্ভব কিছু না, সার্জারীতে সবই হয়।

## সমকামী এন্টিভিজমে ডাক্তারদের অবদান –

চিকিৎসকদের মানুষের এক উপকারী বন্ধুর মতো বলা যায়। সহজ থেকে জটিল সব ধরনের রোগেই সাধারণ মানুষ নির্ভর করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর। নিত্যনতুন গবেষণা ও প্রযুক্তি এগিয়ে নিয়ে যায় চিকিৎসাক্ষেত্রে আর মানুষের জীবনকে আরও সহজ বানিয়ে দেয়। কিন্তু এই মেডিকেল সেক্টরই কখনও মানবসভ্যতার কুৎসিততম একটি ব্যাধিকে যে সমর্থন দিবে আর আরও বিভৎস করে তুলবে তা কখনোই কাম্য ছিলো না।

সমকামীদের দৌড় অনেক দূর এগিয়ে নিতে মেডিকেল সেক্টরের অবদান এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কেবলই নিজেদের সংখ্যালঘু বলে বলে সিমপ্যাথি অর্জন করাটা দীর্ঘস্থায়ী হতো না। এর জন্য দরকার ছিলো শক্তিশালী কোনো কারন যেটাকে সাধারণ মানুষ ফেলে দিতে দ্বিধা করবে। শক্তিশালী কারনের একটি ছিলো পরিসংখ্যান যা ড. আলফ্রেড কিনসি উপস্থিত করেছিলো। আরেকটি ছিলো দেহ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য। হরমোন প্রয়োগ, কসমিক সার্জারী এগুলো মেডিকেল সাহায্য ছাড়া অসম্ভব ছিলো। ড. জন মানি সেসব চিকিৎসকদের মাঝে এগিয়ে ছিলেন যারা বিকৃতিকে নরমালাইজ করার চরম পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

ডা. হ্যারি বেঞ্জামিনের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের নামে মিথ্যা আশ্বাসে আমেরিকায় প্রথম অস্ত্রোপচার শুরু হয়। অসাদু ডাক্তারেরা মানি মেকিং মেশিন হিসেবে নিজেদের পেশাকে ব্যবহার করে এই কুৎসিত কাজে। সমকামীদের সমস্যাটা ছিলো কেবলই মনে। মনের চিকিৎসাই ছিলো একমাত্র উপায়। কিন্তু এমনটা করলে অসাদু ডাক্তারদের 'চিকিৎসার নামে ব্যবসা'টা জমতো না। তাই তারা সমকামীদের চাহিদা অনুযায়ী একের পর এক করতে থাকেন কসমিক সার্জারী। হরমোন প্রয়োগ আর কসমিক সার্জারী এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নারীদেহ থেকে কোমলতা সরে যেয়ে আসতো বাহ্যিক পুরুষালি ভাব, আর পুরুষদেহ পেতো নারীদেহের কিছুটা গড়ন।

পুরুষের পুরুষত্বের জন্য দায়ী টেস্টোস্টেরন হরমোন। এর জন্য কণ্ঠস্বর ভারী হয় আর মাংসপেশী দৃঢ় হয়। নারীর নারীত্বের জন্য দায়ী এস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন হরমোন। এই দুইয়ের প্রভাবে নারীর দেহে কোমলতা প্রকাশ পায়, দেহের বিভিন্ন স্থানে চর্বি জমে আকৃতি দান করে, কণ্ঠস্বর কোমল ও তীক্ষ্ণ করে। এই হরমোন গুলো প্রাকৃতিক ভাবেই নারী ও পুরুষের দেহে ব্যালেন্সড পরিমানে ওঠানামা করে। কিন্তু এই হরমোন গুলোই পুরুষকে পুরুষ বা নারীকে নারী বানায় না। বরং লিঙ্গ পরিচয় তো প্রাকৃতিক, যা বদলানো কারোর সাধ্যে নেই।

সমকামীদের মাঝে ধারণা এসেছিলো হরমোন যেহেতু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাহলে হরমোন প্রয়োগ করেই তারা সত্যিকারের রূপান্তরিত পুরুষ বা নারী হতে পারবে। আর এই ভুল ধারণাকে উস্কে দেয় হ্যারি বেঞ্জামিনের মতো লোকেরা। এভাবেই সূচকীয় হারে বাড়তে থাকে কসমিক সার্জারীর গ্রাহক, প্রচুর টাকা খরচ করে বদলানো হতে থাকে আল্লাহর দেয়া সুস্থ স্বাভাবিক দেহকে।

### এইডস, “গে প্লেগ” –

একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে HIV AIDS এর ব্যাপারে প্রচুর প্রচারণা চালানো হয়েছে। Human Immunodeficiency Virus তথা HIV ভাইরাসের সংক্রমণে মরনব্যাধী এইডস (AIDS) কীভাবে ছড়ায়, কীভাবে এ থেকে বেঁচে থাকতে হবে, করণীয় বর্জনীয় ইত্যাদি প্রচারণা। এই প্রচারণাগুলো বিভিন্ন ক্ষুদ্রে গল্প, লিফলেট, টেলিভিশনে এডভারটাইজ, ছোট নাটক ইত্যাদি উপায়ে বিভিন্ন এনজিও সংগঠন পরিচালনা করেছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ছুট করে চলে আসা এক মহামারী যা নিরীহ মানুষের অকাল মৃত্যুর কারন হয়েছে। কিন্তু এইডস এর উৎপত্তি হওয়া থেকে এর মহামারী আকারে ছড়ানোর ইতিহাসটা মোটেও এমন সহজ কিছু নয়। এর পেছনে আছে এক পঙ্কিল জঘন্য ইতিহাস, বিকৃতির ইতিহাস।

১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে ছুট করেই এই রোগের আবির্ভাব ঘটে আমেরিকার বসবাসকারী জনতার লক্ষনীয় একটা অংশ জুড়ে। একসাথে অনেক রোগের সমাগম নিয়ে রোগীরা হাজির হতে থাকে ডাক্তারের চেম্বারে। সাধারণ জ্বর থেকে শুরু করে ডায়রিয়া, ফাঙ্গাল সমস্যা, রক্তস্ফলিতাসহ বিভিন্ন রোগ একসাথে একই ব্যক্তির মাঝে দেখা যাচ্ছিলো, বেশিরভাগ রোগীরই চিত্র এমনই ছিলো। কারোসি'স সারকোমা নামক ত্বকের বিরল জাতের ক্যানসার, নিউমোসিসটিস নিউমোনিয়া নামক নিউমোনিয়ার এক বিরল সংস্করণ যা সাধারনত মানুষকে আক্রান্ত করে না বরং গবাদীপশুর মাঝেই দেখা গেছে ইতোপূর্বে, এমন সব রোগও দেখা গেছে একসাথে কয়েকজন রোগীকে আক্রান্ত করেছে।

এমন পরিস্থিতি আমেরিকার তৎকালীন ডাক্তারদের জন্য ভীষণ উদ্বেগের কারন হয়ে দাড়ায়। তবে এর কারন অনুসন্ধান করতে যেয়েই বের হয়ে আসে এক জঘন্য সত্য, বিকৃতির পরিণামস্বরূপ এক বিভৎস বাস্তবতা। ডাক্তাররা অনুসন্ধান করার পর খুঁজে পান, এই জটিল মাল্টিডিজিসে আক্রান্ত রোগীদের সবাই ছিলো বিকৃত যৌনকামী তথা সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষ, যারা নিয়মিত একাধিকবার একাধিক লোকের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। যাদের যৌন আচরণও খুবই বিকৃত আর চরম জঘন্য ও অস্বাভাবিক।

কিছুদিন পর আরও একটা তথ্য অনুসন্धानে বের হয়ে আসে যে, এই ধরনের যেসব রোগী এসেছিলো তারা সবাই মারা যাচ্ছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় একের পর এক

রোগ বাসা বেঁধে ঠেলে দিয়েছে তাদের জীবনের করুণ পরিণতিতে। যেহেতু রোগগুলো সমকামীদের মাঝেই পাওয়া যাচ্ছিল, তাই ডাক্তারগণ এর নাম দেন গে রিলেটেড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি বা GRD। পত্রিকায় ও লোকমুখে এটি প্রচারিত হতে থাকে গে প্লেগ বা সমকামীদের মহামারী নামে।

এইডস রোগের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের বিভিন্ন তত্ত্ব এসেছে। তার মাঝে একটি তত্ত্বে দাবী করা হয় যে এইডস এর জন্য দায়ী এইচআইভি ভাইরাস এসেছে আফ্রিকার এক প্রজাতির বানর থেকে। এই তত্ত্বের দাবী ছিলো বানরের সিমিয়ান ইমিউনো ভাইরাস বা এসআইভি কোনো একভাবে মানুষের দেহে প্রবেশ করে হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসে পরিণত হয়েছে। এই দাবীকে বর্নবাদী বলে তীব্র প্রতিবাদ করেন আফ্রিকার গবেষকগণ। তাদের মতে হাজার হাজার বছর ধরেও আফ্রিকার মানুষ এসব বানরদের আশেপাশেই বাস করেছে, এতোদিন তাদের কিছুই হয়নি। হয়েছে এতো বছর পর আমেরিকার কিছু নাগরিকের, পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গদের।

আরেকটি তত্ত্ব আনা হয় যে, ভাইরাস বানর থেকেই এসেছে কিন্তু মার্কিনীদের কর্তৃক ১৯৫০ এর দশকে পোলিও ভ্যাকসিন তৈরিতে ব্যবহৃত শিম্পাঞ্জির শরীর থেকে নেয়া টিস্যু থেকে। কোনোভাবে এই ভাইরাস ভ্যাকসিনেও চলে আসলে মানুষের দেহেও এটি প্রবেশ করে এইচআইভি তে পরিণত হয়।

আরেক তত্ত্ব অনুযায়ী এইডস এর ভাইরাসের উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক না কেনো, এইডস ছড়ানোর মূল কারন এই ভাইরাস না। HIV কেবল একটা কো-ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। আসল কারন কিছু আচরন যেগুলোর কারনে এইডস ছড়ায়, যেমন - অবাধ যৌনতা, অতি বহুগামিতা, উশৃংখল জীবনযাপন, মাদক ও ড্রাগের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ইত্যাদি।

তৃতীয় কারনটিই বেশি প্রাসঙ্গিক আর বাস্তবমুখী তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছে। এই কারনেই দেখা যায় আমেরিকার সমকামী পুরুষদের মাঝেই এইডস ব্যাপক হারে ছড়িয়েছে। শুরুতে রোগটি নিউইয়র্ক আর লস অ্যাঞ্জেলিসে বেশি দেখা গেলেও পরবর্তীতে হিউস্টন, ওয়াশিংটন, মায়ামি, স্যানফ্রানসিসকো ইত্যাদি অঞ্চলেও দেখা যায়। এই সবগুলো অঞ্চলেই ছিলো সমকামীদের সবচেয়ে বেশি আনাগোনা জার্মানির বার্লিনের পরে।

এইডস ছড়ানোর কারন হিসেবে দেখা যায় একই সুচ দিয়ে একাধিক বার একাধিক জন ইঞ্জেক্ট করলে, যাচাই না করে রক্ত নিলে, অনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবন যাপনে রোগটি ছড়ায়। সমকামীদের মাঝে মাদক ও ড্রাগের ব্যবহার তো ছিলোই, তাছাড়া তাদের যৌনাচরণ ছিলো এতোটাই বিকৃত আর প্রকৃতি বিরুদ্ধ যে তাদের মাঝে এইডস ছড়ানোর সব উপায়ই খোলা ছিলো।

তাছাড়া পায়ুসঙ্গম ও ওরালসেক্সের কারনে আরও অনেক যৌন বাহিত রোগ সমকামীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। সমকামী পুরুষদের মাঝে হেপাটাইটিস বি মহামারী আকার ধারণ করেছিলো। আরও বাড়ছিলো স্টিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামিডিয়ায় মতো যৌনবাহী রোগের প্রকোপ। এতো পরিমাণ সমকামী রোগী দেখার পর অনুসন্ধানে ডাক্তারগণ যা পান তা রবার্ট রুট বার্নস্টেইনের বিখ্যাত বই "Rethinking AIDS" থেকে পাওয়া যায়। তার ভাষ্যে উঠে আসে, সমকামী আন্দোলনের সফলতার পর সমকামী পুরুষদের অবাধ বহুগামীতা লক্ষণীয়ভাবে বাড়তে থাকে। এতে করে তাদের মাঝে মলদ্বারের ক্ষত, মাদক সেবন, বিরল সব ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আর পরজীবির সংক্রমণ বাড়তে থাকে বিপুল হারে।

স্বাভাবিক যৌনাচারে এইডস আসার কোনো সুযোগ ছিলো না। এর আবির্ভাব হয়েছেই বিকৃতির হাত ধরে। কিন্তু মিডিয়া তা প্রচার করে নি তেমন। সমকামীদের বিকৃত যৌনাচারের কারনে ছড়ানো মহামারী যখন পুরো পৃথিবীকে ঘায়েল করলো তখনও এইডস এর ছড়ানোর মূল ও বড় কারনটা মিডিয়া ও এনজিও সংস্থাগুলো গোপন করে শুধু কীভাবে এ থেকে বেঁচে থাকা যায় সেগুলোকে ফোকাস করেছে। সাধারণ মানুষের মাঝে বিকৃতির কারনে রোগ ছড়ানোর কথা প্রচার হলে আজ পর্যন্ত সমকামীদের টিকে থাকা আর সম্ভব হতো না।

## হরমোনাল বা শারীরিক ক্রটি নয় বরং মানসিক বিকৃতি -

এলজিবিটি কে জাস্টিফাই করতে এর এন্টিভিস্টরা একটা কথা জনসাধারণের মাঝে ছড়াতে সফল হয়েছে - এটা নাকি একটা হরমোনাল কারন। কিন্তু সত্যি তো এই যে, বিকৃতিরূপে এই উত্থান কোনোভাবেই হরমোনের সাথে সম্পর্কিত নয়। সমকামীতার মূল রোগটাই মানুষের মনে, মনের রোগে প্রভাবিত হয়েই দেহের ওপর চালানো হয় সব মিথ্যা দাবীর জোর।

সমকামীরা বরাবরই বলে আসছে "মনে মনে পুরুষ" বা "মনে মনে নারী", অর্থাৎ তারা নিজেরাই যেনো স্বীকার করে এসেছে তাদের সমস্যাটা মনে, দেহে নয়। আবার এরাই দাবী তোলে সমকামীতা প্রাকৃতিক, জন্মগত। বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপরে তারা নিজেদের ছলচাতুরি আর পাগলামি কথাগুলোকেই ঠাঁই দিয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষও যেনো এসবকে স্বাভাবিকভাবে নেয় তাই ছড়িয়ে দিয়েছে গুজব, বিজ্ঞানের নামে গুজব।

হরমোন সম্পূর্ণ শারীরিক ব্যাপার, হরমোনের প্রভাবে মানবদেহে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়। পুরুষের পুরুষালিভাব আর নারীর নারীসুলভ ভাব পরিলক্ষিত হয় এই হরমোনের ওঠানামার জন্যই। এটা একেবারেই প্রাকৃতিক ও জন্মগত। হরমোনের ম্যালফাংশানের জন্য কোনো পুরুষ সর্বোচ্চ তার পুরুষত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে, একই ভাবে নারী হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ওঠানামায় তার নারীত্বের অপূর্ণতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু এতে করে সে পুরুষ নারী হয়ে যায় না বা নারী পুরুষ হয়ে যেতে পারে না।

নারী আর পুরুষ হবার মূল কারনটাই তার অস্তিত্বের সাথে জড়িত। যে পুরুষ সে জন্মেছেই পুরুষ হয়েই, তার আর কোনোভাবেই নারী হওয়া সম্ভব নয়। আবার যে নারী সে নারী হয়েই জন্মেছে, এটা তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কিছু না যে সে মনে মনে নিজেকে নারী হিসেবে মানতে না পারলে পুরুষ হয়ে যেতে পারবে।

হরমোন প্রয়োগ করে মানুষ তার শরীরে পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু এটা কেবলই বাহ্যিক পরিবর্তন হিসেবে পরিবর্তন হয়, আভ্যন্তরীণভাবে সে মানুষ নিজ লিঙ্গেই থেকে যায়। এটাকে আমরা একটা মেশিন বা একটা কারের সাথে তুলনা করতে পারি। একটা কার বা মেশিনকে বাহিরের পার্টসে কিছুটা পরিবর্তন করলে বা রঙ করলে হয়তো তা দেখতে ভিন্ন দেখাবে, কিন্তু কার্যগত দিক দিয়ে সে মেশিন মেশিনই থাকবে, আর সে কার কারই থাকবে। এই কসমিক পরিবর্তনকেই লিঙ্গ পরিবর্তনে বিশ্বাসী বিকৃতকামীরা পরিবর্তন বলে চালিয়ে দিয়ে আসছে, দিচ্ছে।

কিন্তু আসল কথা হলো সত্ত্বাগত দিক দিয়ে তারা কখনোই নিজের পরিচয় থেকে পালাতে সক্ষম নয়। সার্জারীর দ্বারা শারীরিক পরিবর্তন ঘটানো মূলত চরম পর্যায়ের বন্ধাত্বকরন। হরমোনের প্রয়োগে বাহ্যিক আকৃতির পরিবর্তন হলেও কোনো পুরুষ কখনোই মা হতে পারে

না, কোনো নারী কখনোই বাবা হতে পারে না। নিছকই মনের ধোঁকায় পতিত হয়ে স্বাভাবিক দেহের ওপর ছুরিকাঁচি চালাতে দ্বিধা করে না।

এই চিরসত্যের অনুধাবনও তারা একসময় করে, কিন্তু সেটা সবকিছু (কসমিক সার্জারী করে পুরুষত্ব বা নারীত্ব) হারানোর পর। সান্তনা ছাড়া আর কিছুই দেয়ার থাকে না তখন এসব অসুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারীদের।

### শব্দের খেলা -

শব্দ দিয়েও কতো সহজে মানুষের চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়, কতো ভাবে বোকা বানানো যায় তার বাস্তবিক উদাহরন আছে বিকৃতকামীদের ও তাদের সাপোর্টে কাজ করা লিঙ্গবাটপারদের কাজে। বিকৃতকামীরা শব্দের খেলা হিসেবে অনেক নামের উদ্ভব ঘটিয়েছে সময়ে সময়ে। ট্রান্সজেন্ডার, সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন, জেন্ডার ও সেক্স থিওরীর মতো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দ এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যেন এটা না জানলে যে কেউ মূর্খ থেকে যাবে।

ড. জন মানি প্রথম জেন্ডার শব্দটাকে হাইলাইট করেন জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত অবস্থায়। একটি সাধারণ ইংরেজি শব্দ 'Gender' বা লিঙ্গকে অন্যভাবে উপস্থাপন করেন ড. মানি। সেক্স আর জেন্ডারকে আলাদা করে দেখান তিনি। তাকে জেন্ডার আইডেন্টিটির জনক বলা হয়। তার মতে - "Gender role is used to signify all those things that a person says and does to disclose himself or herself as having the status boy or man, girl or woman, respectively. It includes, but is not restricted to, sexuality in the sense of eroticism." সহজ কথায় সমাজের দৃষ্টিকোণে একজন মানুষ নিজেকে নারী বা পুরুষ হিসেবে প্রকাশ করতে যা কিছু করে তাকে জেন্ডার রোল বলে। যা কেবল যৌন অনুভূতির ক্ষেত্রে নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জেন্ডার রোল থিওরীর মূলবার্তা হলো, মানুষের জেন্ডার রোল সামাজিকভাবে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ কেউ নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্মালেই তাকে আজীবন নারী বা পুরুষ হয়েই থাকতে হবে এটা সমাজ শেখায়। জন মানির মতে মানব শিশুকে কীভাবে লালন-পালন করা হচ্ছে তা নির্ধারণ করে তার জেন্ডার রোল কেমন হবে।

সেক্স ও জেন্ডারের মাঝে মূলগত ও শব্দগত দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। এই পার্থক্য আনা হয় জেন্ডার রোল থিওরীর মাধ্যমে। সেক্সকে বলা হয় শারীরিক বৈশিষ্ট্য যা ক্রোমোজমের সাথে সম্পর্কিত। আর জেন্ডারকে দাবী করা হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একটা নিছক ভূমিকা হিসেবে যা চাইলে প্রভাবিত ও পরিবর্তন করা যায়।

Gay and Lesbian Alliance Against Defamation সংক্ষেপে GLAAD এর সংজ্ঞা অনুযায়ী লিঙ্গ পরিচয় বা জেন্ডার আইডেন্টিটি হলো কোনো ব্যক্তির "deeply internal sence" বা গভীর অন্তর্নিহিত এক অনুভূতি বা বিশ্বাস যা তার নিজের লিঙ্গ পরিচয়কে প্রতিফলিত করে। এই অনুযায়ী জেন্ডারকে তারা দুভাগে ভাগ করে - সিস জেন্ডার (cis gender) আর ট্রান্সজেন্ডার (transgender)। সিস জেন্ডার তাদেরকে বলা হয়েছে যাদের মনের জেন্ডার অনুভূতি জন্মগত জেন্ডার অনুভূতি তথা সেক্সের সাথে মিলে যায় তাদের। আর ট্রান্সজেন্ডার তাদের বলা হয়েছে যাদের মনের লৈঙ্গিক অনুভূতি জন্মগত লৈঙ্গিক অনুভূতির সাথে মেলেনি বরং বিপরীত পরিলক্ষিত হয়েছে তাদের। মানে কেউ নিজেকে মনে মনে ছেলে ভাবলে সে যে জেন্ডার নিয়েই জন্মাক না কেনো, জেন্ডার রোল থিওরী অনুযায়ী সে ছেলেই হবে, এমন।

## অপারেশনের সূচনা -

সমকামীরা দাবি করে তাদের সমকামীতা প্রাকৃতিক একটা চাহিদা, স্বাভাবিক যৌনাচারের মতোই তাদের সমলিঙ্গের প্রতি আগ্রহও স্বাভাবিক। কিন্তু তারা কেবল মনের দিকেই এই চাহিদা অনুভব করে বলে দাবী করতে পারে, দৈহিক দিক দিয়ে তারা ঠিকই নিজ লিঙ্গকে পার করতে পারে না। তাই সময়ে সময়ে নিজ লিঙ্গকে দেহ থেকে বাদ দিতেও দ্বিধা করেনি বিকৃতকামী এই উন্মাদের দল। এরই পরবর্তী রূপ লাভ করে লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারী নাম। ম্যাগনাস হার্শফেল্ড ১৯২০ সাল থেকেই তার ইনস্টিটিউটে লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারী নিয়ে গবেষণা শুরু করে। ১৯২২ সালে এক বোধবুদ্ধিহীন বিকৃতকামীর সার্জারীও করে সেই ইনস্টিটিউটে। সার্জারীর পাশাপাশি তাকে দেয়া হয়েছিলো হরমোন থেরাপিও যেন দৈহিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এটাই ছিলো পৃথিবীর প্রথম লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারী যা সমকামীদের মাঝে পরে জনপ্রিয় হতে থাকে। আরও কয়েকজনকে এভাবেই সার্জারীর পরামর্শ দেয়ার পর একসময় আইনার ওয়েগনার নামের এক সুস্থ সবল পুরুষ সার্জারীর জন্য হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটে আসে। লোকটি ছিলেন উভকামী, তার স্ত্রীও ছিলো কিন্তু লোকটি মেয়ে সাজতে পছন্দ করতো। সে নিজেকে লিলি এলবা নামে পরিচিত করেছিলো পরবর্তীতে। পরপর চারবার অপারেশনের পরে শেষবার তার দেহে জরায়ু প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই তা ব্যর্থ হয় আর একসময় তার যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কারন হয়।

ওয়েগনারের স্ত্রী একজন শিল্পী হওয়ায় ইউরোপিয়ান মিডিয়ার কাছে ওয়েগনারের সার্জারীর কথা পৌঁছে যায় আর মিডিয়া তা রসিয়ে রসিয়ে প্রচার করে। যদিও ওয়েগনার মৃত্যু পথযাত্রী ছিলো, সে সময় হার্শফেল্ড জার্মান থেকে আমেরিকা ভ্রমণ করছিলো বিকৃতির ওপর লেকচার সেমিনার করতে। আমেরিকান বিকৃতকামীরা তাকে এই সার্জারীর জন্য 'যৌনতার আইসটাইন' বলে সম্বোধন করতে থাকে। যদিও তার কাজটি ছিলো পুরোপুরি ব্যর্থ অপারেশন, কিন্তু প্রচারনার জন্য তার বিকৃতি প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়।

এরই ধারাবাহিকতায় তারই ইনস্টিটিউটের হ্যারি বেঞ্জামিন পরবর্তীতে মেডিক্যাল সেক্টরকে কাজে লাগিয়ে বিকৃতকামীদের পাগলামিকে পুঁজি করে আরও হরমোন থেরাপি আর সার্জারী চালিয়ে যায় যার বিস্তার আরও সম্প্রসারিত ছিলো। বেঞ্জামিন নিজেই মানুষের মাঝে "ভুল দেহে আটকা পরা" এর ব্যাপারে প্রচারণা চালাতে থাকে, আবার নিজেই এর সমাধান হিসেবে নিয়ে আসে দেহকে বদলে ফেলার উপায় তথা সার্জারী। এতে করে দলে দলে সমকামীরা নিজেদের বদলাতে তার ফাঁদে পা দেয় আর বদলে ফেলতে থাকে তাদের প্রাকৃতিক দৈহিক গড়নকে।

আধুনিক ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনেও আমরা এই সার্জারীর ব্যাপক প্রসার দেখতে পাই। দেহের অভ্যন্তরে সুস্থ পুরুষের বা সুস্থ নারীর প্রজননতন্ত্র থাকলেও তারা বাহ্যিকভাবে কসমিক অপারেশন করে বদলে ফেলছে নিজেদের দৈহিক গড়নকে।

## বিকৃতির প্রচারে মিডিয়া –

মিডিয়া বা গণমাধ্যমকে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে। দেশ ও জাতির খবর, পুরো বিশ্বের খবর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম। মিডিয়াকে হতে হয় নিরপেক্ষ। কোনো নির্দিষ্ট পক্ষের হয়ে দালালি করলে তা আর নিরপেক্ষ মিডিয়া থাকে না। যে মিডিয়া নির্দিষ্ট কোনো দল বা গোষ্ঠীর দালালি করে আর জনসাধারণের মাঝে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ায় তা অবশ্য পরিত্য্য।

রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে আমরা মিডিয়ার অপব্যবহার দেখি। বিভিন্ন নিউজপেপার বা চ্যানেল দেখা যায় বড় কোনো ক্ষমতাশীল দলের দালালি করে আর তাদের বিরুদ্ধদলীয় লোকদের ডাউনপ্লে করে। মিডিয়ার মিথ্যাচার সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহের উদ্বেক ঘটায়, এতে করে কোনো মিডিয়াকেই আর বিশ্বাস করার ভরসা আসে না। আবার এই মিডিয়াই সন্ত্রাসি ভূমিকা পালন করে কিছু এজেন্ডার পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে। যেমনটা আমরা দেখি আমেরিকার হয়ে কথা বলা মিথ্যাবাদী মিডিয়াগুলো কীভাবে মুসলিমদের জঙ্গী হিসেবে রিপোর্ট করার আত্মপ্রদর্শন দেখায়।

মিডিয়ার মিথ্যাচার মানুষকে ভীষণভাবে ধোঁকাতেও পতিত করে। বেশিরভাগ শ্রমজীবী খেটেখাওয়া মানুষ আর কর্মব্যস্ত জনতা দেখা যায় নিজে থেকে কোনো খবরকে ভেবেচিন্তে যাচাই-বাছাই করার সময় সুযোগ পান না। এই মহলই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন মিডিয়ার ওপর আর মিথ্যা খবরগুলোকেও গ্রহণ করেন পরম সত্যের মতো করে। এই গ্রুপের মানুষই মিথ্যা মিডিয়ার বড় শিকার, তাদের পরিবারের সাধারণরাও দেখা যায় মিথ্যা খবরগুলোর অন্ধকারেই পতিত হয়ে থাকে। তাই নিজেদের অজান্তেই প্রোপাগান্ডাকে সত্যি মনে করে অপরাধীদের সাপোর্ট করে বসেন আর নির্দোষদের দোষী সাব্যস্ত করেন।

এলজিবিটি প্রচারেও মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের সময় থেকে এ পর্যন্ত সমকামীদের বিভিন্ন বিকৃতাচারকে মিডিয়া এমনভাবে রঙীন করে রিপোর্ট করে জনসম্মুখে এনেছে যে পশ্চিমা সমাজে সময়ের সাথে সাথে মানুষ বিকৃতিকে স্বাভাবিক মানতে পারুক আর না পারুক এর বিরোধিতা করা থেকে দমে গেছে একেবারেই।

ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের করা লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারীর কথা মানুষের মাঝে মিডিয়াই প্রচার করেছে। মিডিয়ার প্রভাবেই আরও বেশি মানুষ অতি সহজেই জানতে পারে সার্জারীর ব্যাপারে। মিডিয়ার মিথ্যাচারের কারনে সার্জারীর কালো অধ্যায়ের ব্যাপারে মানুষ বেখবর রয়ে যায় আর অসুস্থ চিন্তার বিকৃতকামীরা ফ্যান্টাসির বশবর্তী হয়ে সার্জারীর স্রোতে গা ভাসায়। এই ফ্যান্টাসিকেও মিডিয়া পুঁজি করে আর আরও এমন এমন নিউজ বানায় যাতে মানুষের ফ্যান্টাসি আরও বাড়ে।

## বাংলাদেশে বিকৃতির প্রবেশ-

বাংলাদেশের সমাজ সবসময়ই একটি রক্ষনশীল সমাজ ছিলো এবং এখনও আছে। এদেশের জনগণের বেশিরভাগই মুসলিম ধর্মাবলম্বী। সাথে হিন্দু, খ্রিস্টান আর বৌদ্ধ ধর্মের লোকও এদেশে একসাথে বাস করে এসেছে। বাঙালী জাতির মাঝে ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব বেশ লক্ষ্যনীয়। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কাজই মানুষ নিজ নিজ ধর্মের নীতি মেনে পালন করে এদেশে। নৈতিকতায় ঘেরা থাকে বাঙালীর প্রতিটি পরিবার।

বিকৃতি প্রচারে সর্বকালেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নৈতিকতা। তাই আমেরিকার বাধভাঙ্গা বিকৃতির প্রচার সফল হবার জন্য তাদের সবার আগে সমাজ থেকে নৈতিকতাকে উপড়ে ফেলতে হয়েছিলো। খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী সমাজকে ধর্মের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে বিমুখ করতে নানা ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিলো সমকামী ও নারীবাদী আন্দোলনকারীরা। কারন সমাজ থেকে মূল্যবোধকে ঢিল দিতে পারলেই তাদের আন্দোলন সফল হতে পারতো, নয়তো আন্দোলন করাই সম্ভব হচ্ছিল না।

বাংলাদেশ আমেরিকার মতো নয় কখনোই। এদেশের সংস্কৃতি এতোটাই সমৃদ্ধশালী যে এখানে কোনো ধরনের অপসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটলেই গ্রাম বাংলার মানুষ সেসবকে দুয়ো দিও বিতাড়িত করে দেন। শহর অঞ্চলগুলোতে শিক্ষিত সমাজের ছোট অংশ জুড়ে যদিও বরাবরই একটা প্রগতিশীল মহল থাকে যারা বিদেশি সংস্কৃতিকে (তা ভালো হোক কি মন্দ) গ্রহন করাকে প্রগতিশীলতা মনে করেন। কিন্তু সে মহল নিতান্তই ক্ষুদ্র বিধায় মেজরিটির জনসাধারণের সাপোর্ট সহজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশের আলিম সমাজ বরাবরই যেকোনো অপসংস্কৃতির ব্যাপারে একেবারে সাধারণ জনতা পর্যন্ত দাওয়াত পৌছে দিতে সক্ষম এবং সক্রিয় থাকায় আজও এদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি।

এই রক্ষনশীল সমাজে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানো প্রায় অসম্ভবই ছিলো। কিন্তু বিকৃতির ধজাধারীরাও থেমে থাকে নি। কুটকৌশল ব্যবহার করে হলেও ধীরে ধীরে বাংলাদেশেও বিকৃতির প্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছে এলজিবিটি গোষ্ঠী। এনজিও পর্যায়ে প্রথমে মানবাধিকারের নাম নিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ফ্রি সেবাদানের নামে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে থাকে তারা, যার মাঝে বাংলাদেশও আছে। এদেশে যে এনজিও সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা ছিলো ব্র্যাক (BRAC)।

২০০৫ সালে এদেশে প্রথম ব্র্যাক তাদের কর্মসূচি শুরু করে। তাদের কাজের প্রচারণা ছিলো মানবাধিকারের নামে। দরিদ্রদের সহজ চিকিৎসা সেবা দেয়া, শিশুদের আনন্দময় শিক্ষার

উদ্দেশ্যে কিশোরী কেন্দ্র খোলা, ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋন দিয়ে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষুদ্র পর্যায়ে ব্যবসা শুরুর সাহস যোগানো ইত্যাদি ছিলো ব্র্যাকের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ সমূহ। শুরুর দিকে যে কেউই ভাববে ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিও গুলো তো মানুষের ভালোর জন্যই কাজ করছে। কিন্তু তাদের কাজ শুরুর প্রায় ২০ বছর পর মানুষ অবগত হয় ব্র্যাকের মূল লক্ষ্য ছিলো বিকৃতিকে ধীরে ধীরে ছলেবলে বাংলাদেশে প্রবেশ করানো। তারা কাজই করতো দরিদ্র আর দুস্থ মানুষদের নিয়ে যা সাধারণ মানুষের ভরসা অর্জনে সহায়ক হয়। পরবর্তীতে নিজেদের একাডেমিক পর্যায়ে শক্তিশালী করে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের মাধ্যমে। ব্র্যাকের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র যেমন পোশাকশিল্পে আড়ং, মানি ট্রানজিশনে বিকাশ ইত্যাদি এতো ভালো সার্ভিস আর ভালো কুয়ালিটি নিশ্চিত করেছে যে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ অনেকটাই নির্ভর হয়ে যায় এই ব্র্যান্ডগুলোর ওপর। অথচ এসব থেকে প্রাপ্ত অর্থ তারা কাজে লাগিয়েছে বিকৃতির প্রচার প্রসারে।

বাংলাদেশে "বন্ধু" আর "জাগো ফাউন্ডেশন" নামে এমন আরো এনজিও আর গ্রুপও রয়েছে যারা মানবাধিকার আর নারীবাদের নামে মূলত সমকামীতার প্রচার করে গেছে আর এখনও যাচ্ছে।

## বিকৃতি যখন উগ্রবাদ –

এলজিবিটি এর প্রচার করার সময় এর একটিভিস্টরা তথা বিকৃতকামীরা যতোটা নিশ্পাপ ও অসহায় একটা ভাবমূর্তির প্রকাশ করে, বাস্তবে তারা মূলত এতোটা শান্ত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমকামীদের উগ্রবাদীতার স্বীকার হতে হচ্ছে মানুষকে। যার বড় উদাহরন স্বয়ং আমেরিকা নিজেই। সমকামীদের কে যারা সাপোর্ট না করে বিকৃতির বিরোধীতা করে তারা তো আছেই, বরং যারা সমকামীতার বিরোধিতা করেন না তাদেরও কোনো আচরন বা পদক্ষেপ বিকৃতকামীদের অপছন্দ হলে তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে যায় তারা। আর যারা বিকৃতির বিরোধিতা করেন তাদেরকে জীবননাশের হুমকিও দেয়া হয় বিকৃতকামীদের থেকে।

সম্প্রতি আমেরিকার চার্লি কার্ক, যিনি একজন রাজনৈতিক উঁচু পদের ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাকে এক সমকামী প্রকাশ্য দিনের আলোয় হত্যা করে। এই খবরটার বেশি প্রচার হয়েছে কারন চার্লি কার্ক রাষ্ট্রের বিশেষ একজন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এমন আরও অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা সমকামীরা ঘটাচ্ছে, কিন্তু মিডিয়া তা বিশ্ববাসীর সামনে তেমন আনে না। ১৯৬৯ এর স্টোনওয়ালের দাঙ্গা সহ সে সময়কার সমকামীদের উগ্র আচরনের ইতিহাস মনে করলেও দেখা যায় কতোটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে বিকৃতকামীরা।

বাংলাদেশের মতো একটা সভ্য শালীন সমাজের দেশেও এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে তা যে কারোরই কল্পনার বাহিরে ছিলো। সম্প্রতি ২০২৫ সালেই সিলেট মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এক সমকামী সাফওয়ান চৌধুরী রেবিল দুইজন সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সরোয়ার হোসেন ও আসিফ মাহতাব উৎস স্যারকে হত্যা করার কার্টুন ঐকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে। তার পোস্টের শিরোনামও ছিলো হত্যার উল্লেখযুক্ত। এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে অনেক প্রতিবাদ প্রতিরোধ করা হয় সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা।

সাফওয়ান চৌধুরী রেবিল এই ঘটনার আরও আগে থেকেও সমকামীদেরকে মারমুখী হওয়ার জন্য নিজ টাইমলাইনে পোস্ট ও লাইভের মাধ্যমে প্ররোচনা দিতো, নিজ ক্যামপাসে নিজের সাথে লাঠি বহন করতো অস্ত্র হিসেবে। তার এই আত্মপক্ষের পেছনে শক্তি যোগান দেয় এক অজানা কুচক্রী মহল।

মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকেও তার ট্রান্সজেন্ডার হবার ব্যাপারকে মেনে নেয়া হয় আর তাকে মেয়েদের ওয়াশরুম ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। যদিও শিক্ষার্থীদের কেউই তাকে ছেলে বা মেয়ে কোনো ওয়াশরুমেই প্রবেশ করতে দেয় নি নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে। পরবর্তীতে রেবিলের বিভিন্ন উগ্র আচরন নিয়ে তার পুরো ক্লাস প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানায়। এর সাথে যুক্ত হয় স্যোশাল মিডিয়ায় শিক্ষকদের হত্যা করার উগ্রবাদী

কার্টুনচিত্রের পোস্টার অভিযোগ। সবশেষে রেবিলকে তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়।

মজার ব্যাপার হলো, রেবিল একটা বিকৃতকামী এটা নিশ্চিত প্রকাশ্য সত্য হওয়ার পরেও বাংলাদেশের সেকুলার এলিট সমাজের একটা অংশ তার পক্ষ নিয়ে তাকে বহিষ্কারের বিরোধিতা করে আর তীব্র নিন্দা জানায়। সে নিন্দা আবার বড় বড় মেইনস্ট্রিম মিডিয়া প্রচার করে মূলপাতার হেডলাইনে। মিডিয়া সম্ভ্রাসের আরও একটি উদাহরন পেশ হয়।

### শিক্ষা ব্যবস্থায় বিকৃতি প্রবেশের ষড়যন্ত্র -

শিক্ষাকে বলা হয় একটি জাতির মেরুদণ্ড। কোনো জাতিকে ধ্বংস করার সহজ আর কার্যকর একটি উপায় হলো সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থায় বিষপ্রয়োগ করা। অর্থাৎ শিক্ষার নামে মূর্খতা ও কুশিক্ষার প্রসার ঘটানো। এর মাধ্যমে একেবারে মূল পর্যায় থেকে শিশুর মানসিক বিকাশ হয় শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দিয়ে আর এটাকেই সে পরবর্তীতে সঠিক শিক্ষা ভেবে ধোঁকায় নিমজ্জিত থাকে।

বাংলাদেশে যেহেতু নৈতিক পর্যায়ে বাধা দূর করে বিকৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি, তাই এলজিবিটি প্রতিষ্ঠাকারী এজেন্ডার আরেক লক্ষ্য ছিলো এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষপ্রয়োগ করা। সে লক্ষ্যে ধীরে ধীরে পাঠ্যবইয়ে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে অল্প অল্প করে প্রথমে ছেলে মেয়ের পেশাগত পরিচয়কে একই ক্যাটাগরি বা শ্রেণিতে আনা হয় যেনো নারী পুরুষের তথাকথিত জেন্ডার রোল সমাজের প্রচলিত ও প্রকৃতিগত জেন্ডার রোল থেকে মুক্ত হয়ে একই শ্রেণিতে চলে আসে। শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়েও জেন্ডার রোলকে তাদের লেন্সে দেখানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে বছরের পর বছর।

অবশেষে প্রকাশ্যে ২০২২ সালে ৭ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ৫১ নং পেইজে শরীফ থেকে শরীফা হবার গল্প হিসেবে ট্রান্সজেন্ডারিজমকে নরমালাইজ করার চূড়ান্ত আত্মপ্রদর্শন দেখানো হয়। গল্পটি ছিলো এমন যে, কোনো স্কুলের এক ক্লাসে একজন "খুশি" নামক শ্রেণি শিক্ষিকা তার ক্লাসে এক নারীর পোশাক পরিহৃত লোককে নিয়ে এসে তার ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। নারী সাজা লোকটি নিজেকে অসহায় হিসেবে প্রকাশ করে, সে কীভাবে মেয়ে হবার জন্য বাড়ি থেকে ও গ্রাম থেকে পালায় আর পরবর্তীতে নিজের মতো চিন্তাধারার মানুষদের দলে যোগ দিয়ে থাকা শুরু করে ও বড় হবার পর আবার গ্রামে ফিরে আসে নারীর বেশে সে গল্প শোনায। গল্পটিতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিলো শরীফ নামক লোকটি "মনে মনে" নিজেকে নারী ভাবতো বলে মেয়ে হতে চেয়ে পরিবার ও সমাজ ত্যাগ করে।

অথচ গল্পটিকে জনসাধারণের কাছে প্রচার করা হয়েছে নিরীহ হিজরার গল্প হিসেবে, ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিকেও তৃতীয় লিঙ্গ তথা ইন্টারসেক্স বা হিজরার সাথে সুকৌশলে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। একারণেই প্রথমে সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকগণ বিকৃতকামীদের ষড়যন্ত্র ধরতে পারেন নি।

সৌভাগ্যজনক ভাবে ঐ মূহুর্তে দেশের সচেতন নাগরিকগণ অনলাইনে প্রথমত সক্রিয় হয়ে ওঠেন এর প্রতিবাদে। এদের মাঝে সামনের সারিতে এগিয়ে ছিলেন ড. সরোয়ার হোসেন স্যার যিনি নিরলসভাবে বছরের পর বছর ধরে সাধারণ মানুষকে এলজিবিটির বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সচেতন করে আসছিলেন। অনলাইনে তীব্র প্রতিবাদের পরেও পাঠ্যবইয়ের সে গল্প না সরানোর কারনে প্রতিবাদ অফলাইনে তীব্র রূপ নিতে থাকে। এরই রেশ ধরে ২০২৩ সালের এক টিচার্স কনফারেন্সে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ মাহতাব উৎস স্যার প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে ৭ম শ্রেণির সেই বইয়ের পৃষ্ঠাটি বের করে ছিড়ে ফেলেন আর অন্যদেরও এরূপ করার আহ্বান জানান।

আসিফ মাহতাব উৎস স্যারের এই প্রতিবাদ সাধারণ তরুণ সমাজে বেশ সাড়া জাগায়। অভিভাবকগণও নড়েচড়ে বসেন আর নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রতিবাদ চালাতে থাকেন। তীব্র প্রতিবাদের মুখে সরকারকে বাধ্য হতে হয় স্বীকার করতে যে গল্পটি পরের বার বই বিতরণের আগেই বাদ দেয়া হবে।

### শব্দ বিভ্রাট : হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার -

এলজিবিটি মুভমেন্টের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার বেশ লক্ষণীয়, এরা ট্রান্সজেন্ডারদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। এটা তাদের একটা কৌশল যেটা অবলম্বন করে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও চাকুরী নিয়োগের ক্ষেত্রেও তৃতীয় লিঙ্গ অপশন প্রবেশ করিয়েছে। মানুষের সচেতনতার অভাবে এভাবেই এলজিবিটি কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের চোখে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পরছে।

তৃতীয় লিঙ্গ বলতে সাধারণ মানুষ যাদের বুঝে তারা মূলত হিজড়া সম্প্রদায়। হিজড়াদের বলা হয় ইন্টারসেক্স যারা মূলত যৌন প্রতিবন্ধী। জন্মগত কারণেই তাদের যৌনাঙ্গ পরিপূর্ণ থাকে না বা ত্রুটিপূর্ণ থাকে। যার কারনে পূর্ণাঙ্গ বয়সে তারা মেয়ে হয়েও পুরুষালী কিছু ভাব থাকে বা ছেলে হয়েও মেয়েলি কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এটা সম্পূর্ণই শারীরিক ত্রুটি, এই ত্রুটির কারনে তারা মেয়ে থেকে ছেলে বা ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে যায় না।

হিজড়া শিশুও অন্য সব শিশুর মতো দুই লিঙ্গের এক তথা ছেলে অথবা মেয়ে হয়েই জন্ম নেয়। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের যে বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারনেই হয়। অটিসম বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে যেমন আমরা জানি তারা

জন্মগতভাবেই মস্তিষ্কের ত্রুটি নিয়ে বড় হয় বলে বুদ্ধিগত দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা হয় ও আচরনের দিক দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়া হয়। যৌন প্রতিবন্ধী তথা হিজড়ারাও এমনই ত্রুটিযুক্ত যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্ম হয় বলে বয়ঃসন্ধিকালে তাদের এই প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ পায়।

হিজড়া সম্প্রদায়কে নিয়ে ইসলামি শরীয়তে বিধানও আছে। তাদেরকে নারী বা পুরুষের মতোই বিবেচনা করতে হবে। তাদের সম্পদ বন্টন, বিয়ে, পর্দা সহ জীবনের যাবতীয় সব বিধিবিধান নারী বা পুরুষের মতোই হবে। লৈঙ্গিক প্রতিবন্ধকতার কারনে সমাজে নিগ্রহের শিকার তাদেরকে করা যাবে না, বরং তা হবে যুলুম। হিজড়াদেরও বিয়ের অধিকার আছে যদি তারা বিয়ের উপযুক্ত হয়, তথা সন্তান জন্মদানে সক্ষম হয়। হিজড়াদের ওপরও পর্দা ফরজ নারী ও পুরুষ হিসেবে। হিজড়া সন্তানও পিতামাতার সম্পদের ভাগ পাবে তার অন্যান্য ভাইবোনের মতোই। ইসলামে তাদের কোনো বৈষম্যের শিকার করা হয়নি। তবে সমাজ যদি ইসলামের আদল মেনে না চলে তখন আমরা দেখতে পাই হিজড়া হওয়ার জন্য তাদের শত অপমান আর বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

এই বৈষম্যকে পুঁজি করেই এলজিবিটি লিঙ্গ বাটপারেরা হিজড়া তথা ইন্টারসেক্সের নামে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় বাংলাদেশসহ এমন রক্ষনশীল সমাজগুলোতে। যেহেতু এসব দেশে সরাসরি সমকামী পরিচয়ে তাদের কেউ স্বীকৃতি দেবে না বরং বিতাড়িত করবে, তাই ছলনার কৌশলেই মাইনরিটি কার্ড খেলে আসছে বিকৃতকামীরা। এদের কারনে এখন দিন দিন অবস্থা এমন হচ্ছে যে আসল হিজড়াদেরই তাদের যতোটুকু সামাজিক অধিকার দেয়া হয়েছিলো তা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে।

পৃথিবীতে হিজড়াদের সংখ্যা বেশ নগন্য, টোটাল জনসংখ্যার কেবল ০.০১৮% মানুষ পৃথিবীতে হিজড়া বা ইন্টারসেক্স হন। অথচ দেশের অবস্থা দেখলে মনে হয় ছুট করেই যেন হিজড়া গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাসে চাঁদা তোলায় সময় বা রাস্তাঘাটে বা বিভিন্ন স্থানে আসলে হিজড়ার বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুস্থ মানুষ যাদের দেখে মানুষ ভাবছে হিজড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়দিন পরপরই নিউজ প্রকাশিত হয় তৃতীয় লিঙ্গের কেউ প্রথম নিউজ রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়েছে বা কোনো সম্মানিত চাকুরী পেয়েছে। অথচ ভালো করে অনুসন্ধান করলেই বের হয়ে আসে এরা ইন্টারসেক্স না বরং ট্রান্সজেন্ডার তথা লিঙ্গ বাটপার। এদের মাঝে হোচিমিন ওরফে রোকন খুবই পরিচিত মুখ।

## ইসলামই সমাধান -

ইসলামি শরীয়তে পুরুষ ও নারীর জন্য লৈঙ্গিক পরিচয় ও যার যার লৈঙ্গিক ভূমিকাকে খুবই জোর দেয়া হয়েছে। পুরুষকে অবশ্যই পুরুষ হবার সকল ভূমিকা পালন করতে হবে, তাকে পরিবারের হাল ধরতে হবে, পিতা মাতা ভাইবোন থেকে শুরু করে নিজ স্ত্রী সন্তানদের প্রতি পুরুষের আছে অনেক গুরু দায়িত্ব। এসব দায়িত্বের ঠিকঠাক পালনই পুরুষকে পুরুষ বানায়, নয়তো সে হয় অযোগ্য কাপুরুষ। একইভাবে নারীকে নারী হিসেবে পরিবারে নারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। নারী কোমলতা ধরে রাখবে, পিতামাতা ভাইবোন সহ স্বামী সন্তানদের প্রতি সকল দায়িত্ব পালন করবে, নিজ নারীত্বের খেয়াল রাখবে, সম্ব্রম রক্ষা করে চলবে। নারী আর পুরুষ কখনোই সমান নয় অধিকার ও ভূমিকায়, বরং তারা একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক।

ইসলামে নারী পুরুষের বেশভূষার ব্যাপারে এসেছে কঠোর হুকুম। কোনো পুরুষ কোনো নারীর বেশ নিতে পারবে না, নাই বা কোনো নারী কোনো পুরুষের বেশ নিতে পারবে। হাদিসে এসেছে,

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন।" (সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৯)

আরও এসেছে,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীবেশী পুরুষদেরকে এবং পুরুষবেশী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন" (সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৮)

আরও একটি হাদিসে এসেছে,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সেই পুরুষের ওপর যে মেয়েলী পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর ওপর, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে"। (সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৬৯)

অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধানকারীদের প্রতি লানত বা অভিশাপ দেয়া হয়েছে। এটি চরম পর্যায়ে নিষিদ্ধ একটি কাজ ইসলামি শরীয়তে।

শরীয়তের বিধান মেনে চললে যেখানে কেউ বিপরীত লিঙ্গের পোশাকই পরতে পারছে না বা বেশ নিতে পারছে না সেখানে বিপরীত লিঙ্গের জীবন যাপন করার চিন্তাও কারো মাথায় আসতে পারে না। ট্রান্সজেন্ডার দাবী করা বিকৃতকামীদের উত্থানের আগেই দমিয়ে দেয়া সম্ভব এই একটি বিধানের দ্বারাই। ইসলামি মূল্যবোধের জাগরন মানব মস্তিষ্ককে সব ধরনের শয়তানী ষড়যন্ত্র থেকে ও ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে যথেষ্ট হয়ে যায়।

ইসলামে সমকামিতা সরাসরি হারাম। কুরআন থেকে আমরা কওমে লুতের নির্মম পরিনতির কথা জানতে পারি যার কারনই ছিলো সমলিঙ্গের প্রতি যৌন কামনা। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুগে মানুষের ওপর বড় বড় আযাব প্রেরন করেছেন মানুষের গোমরাহীর কারনে। কিন্তু বিকৃত যৌনাচারের মতো আযাব বাকি আযাবগুলোর তুলনায় বেশ ভয়ানক ছিলো। কওমে লুতের পরেও আমাদের সামনে ইতিহাস থেকে উঠে আসে ইতালির পম্পেই নগরীর ধ্বংসস্তুপ। যদিও আমরা কোনো ওহীর মাধ্যমে জানতে পারিনি যে পম্পেই এর দূর্যোগ সে জাতির ওপর আসমানী কোনো আযাব ছিলো কিনা, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সে জাতি নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলো যার মাঝে বিকৃত যৌনাচারও ছিলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামি শরীয়তে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হাদিসে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকেই হত্যা করবে”। (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৬২; তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৫৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬০৯; বায়হাকী, হাদীস নং ১৬৭৯৬; হাকিম, হাদীস নং ৮০৪৭, ৮০৪৯) বিকৃতকামীর জন্য পরকালীন শাস্তি হলো আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা কোনো মহিলার মলদ্বারে গমন করে।” (ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৮০৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬৫)

এমন ভয়ানক শাস্তি কার্যকর হলে স্বাভাবিকভাবেই সমকামীতার ধ্বংসাত্মক প্রলয় ও ঢেউ নিজ থেকেই নিস্তেজ হয়ে আসবে, আর এভাবেই একসময় কেউ আর প্রকাশ্যে বিকৃতির প্রচার প্রসার করতে পারবে না। দুনিয়াতে এই শাস্তি সমাজের ফিতনা রোধ করবে, আর ঈমানদার যেকেউ আখিরাতকে ভয় করে বিকৃতির চিন্তা থেকেও দূরে থাকবে।

## সচেতনতাই শক্তি -

সমকামীতার আগ্রাসন থেকে প্রজন্মকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় সচেতনতার প্রসার। মানুষের সচেতনতার অভাবকেই কাজে লাগিয়ে এসেছে বিকৃতকামী স্বার্থান্বেষী মহল। সচেতন সমাজে তাদের কোনো শক্তিই আর অবশিষ্ট থাকে না বিকৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কেননা বিকৃতি যে আসলেই বিকৃতি তা স্পষ্ট, আর এর পেছনের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে গেলে তা আর রেখেটেকে রাখার উপায় থাকে না।

শব্দের মারপ্যাঁচে বাংলাদেশে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও সংগঠন এলজিবিটি প্রচার করে এসেছে। একে আইনী প্রক্রিয়ায় অধিকার হিসেবে আইন পাশ করারও ষড়যন্ত্র ইতোমধ্যে করা হয়ে গেছে। ড. সরোয়ার হোসেন বরাবরই বাংলাদেশের মানুষকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন করে এসেছেন বলে শিক্ষিত ও এলিট নাগরিকদের একটা অংশ এখন শব্দের এই ছলনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। এই ক্রমাগত সচেতনতার প্রসারই ঠেকাতে পেরেছে ধোঁকার বসে বিকৃতির অধিকারের আইন পাশ করাকে।

বাঙালি বরাবরই সংগ্রামী জাতি। এদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা কখনোই সজ্ঞানে এদেশের মাটিতে বিকৃতিকে টিকতে দেবে না। তাই দরকার বিকৃতির প্রতিটি ব্যাপারে আপ টু ডেট থাকা, সচেতন থাকা। বিদেশি অনেক সংস্থাই ডলারের লোভ দেখিয়ে দেশিও বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে বিকৃতি প্রচারের জন্য প্রলোভন দেখায় আর কাজ করিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব সেসব দেশিয় প্রতিষ্ঠানের এহেন কাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, তাদের সকল সার্ভিস ও পন্য বর্জন বয়কট করা। যেমন ব্র্যাকের অঙ্গ সংগঠন আড়ং একটি নামি-দামি পোশাকের ব্র্যান্ড হলেও বিকৃতির সমর্থনে থাকায় একে বর্জন বয়কট করা এদেশের মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

পারিবারিকভাবে সচেতনতা নিশ্চিত করতে পারলে সবচেয়ে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। সন্তানের প্রতিপালনে বর্তমানের মা বাবার অবশ্যই বিকৃতির ব্যাপারে সচেতন করার বিষয়টি মাথায় রাখতেই হবে। নিজ পরিবারের ভাইবোন আত্মীয়স্বজন সবাইকে যথাসাধ্য বিকৃতি ও এর প্রচার প্রসার নিয়ে সচেতন করতে থাকতে হবে। এতে করে বিকৃতকামীরা যতোই ষড়যন্ত্র করুক না কেনো সফল হয়ে উঠতে পারবে না সামাজিক অবক্ষয় ঘটানোতে।

## রেফারেন্স -

১. কুরআনুল কারীম
২. অবক্ষয়কাল - আসিফ আদনান
৩. সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন - ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন